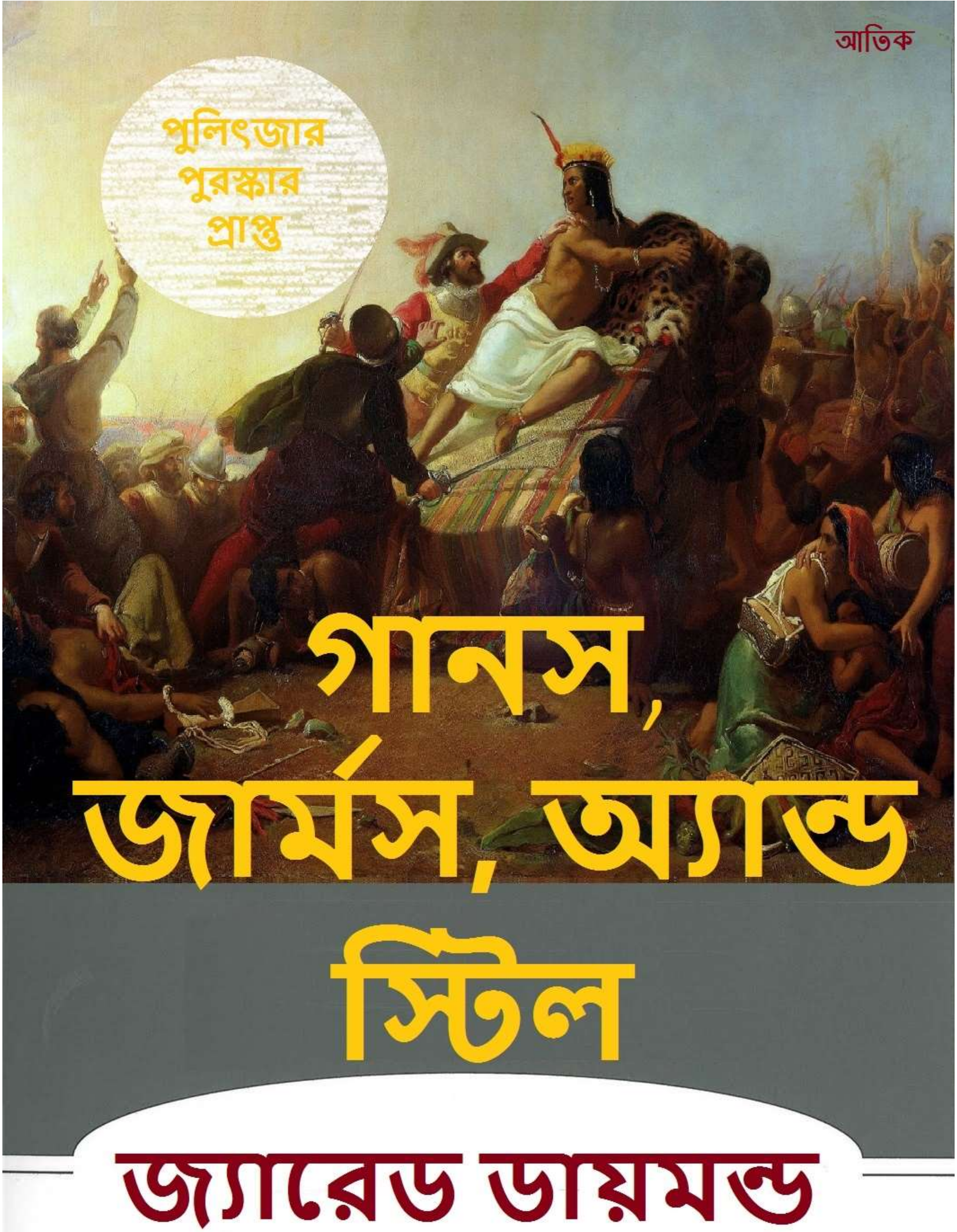

আতিক

পুলিৎজার
পুরস্কার
প্রাপ্ত

# গানস, জার্মস, অ্যান্ড স্টিল

## জ্যারেড ডায়মন্ড

ট্রান্সক্রিয়েশন: সাইফ খন্দকার

গানস
জার্মস অ্যান্ড
স্টিল

আফ্রিকা থেকে অ্যামাজন— একই মানুষ, বহুধা বসুধা। ১৩ হাজার বছরে প্রতিটি সমাজ বিকশিত হয়েছে যার যার ভিন্ন পথে। সভ্যতার ইতিহাসকে অসংখ্য ভাষ্যকার বিবৃত করেছেন নানাভাবে। নৃতত্ব থেকে ব্যাধিবিদ্যা, পরীক্ষাগার থেকে প্রাযুক্তিক উত্‌কর্ষ— কতভাবে যে নির্ণীত হয়েছে বিকাশের ধারা! পুরো গল্পটিকে গানস, জার্মস অ্যান্ড স্টিল নামে এক মলাটে বেঁধেছেন পুলিৎজারজয়ী জ্যারেড ডায়মন্ড। বিশ্বের ইতিহাসযাত্রা অথবা ইতিহাসের বিশ্বভ্রমণ—

# গানস, জার্মস অ্যান্ড স্টিল

## মুলঃ জ্যারেড ডায়মন্ড

### ট্রান্সক্রিয়েশনঃ সাইফ খন্দকার

বনিকবার্তা

# সূচিক্রম

১. পৃথিবীর ইতিহাস পেঁয়াজসদৃশ ৫

২. ইয়ালির প্রশ্নে পিছিয়ে পড়া সমাজের কৌতূহল ৭

৩. গ্রেট এপ থেকে মানুষ ১০

৪. ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তন ১৩

৫. কাহামার্কার সংঘর্ষ: নতুন পৃথিবীতে ইউরোপীয় আগ্রাসন ১৬

৬. ইস্পাত বারুদ মহামারীর ১৯

৭. হ্যাভস ও হ্যাভ-নটসদের বৃত্তান্ত ২১

৮. খাদ্যোৎপাদন থেকে বিনিময় প্রথা ২৪

৯. শিকারি-সংগ্রাহক বনাম কৃষিনির্ভর সমাজ ২৭

১০. উদ্ভিদের ওপর কর্তৃত্বের চেষ্টা ৩০

১১. সব সমাজের অবদানে কৃষির বিকাশ ৩৩

১২. ফার্টাইল ক্রিসেন্টের কর্তৃত্ব ৩৬

১৩. পোষ মানেনি সব পশু ৩৯

১৪. গৃহে পালনযোগ্য পশুর ছয় বৈশিষ্ট্য ৪২

১৫. অক্ষাংশ মানুষের ইতিহাস সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে ৪৫

১৬. ইতিহাসে বড় নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে জীবাণু ৪৮

১৭. নগরায়ণ ও বাণিজ্যপথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে জীবাণু ৫২

১৮. জ্ঞানই ক্ষমতার উৎস ৫৬

১৯. সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ লিখিত ভাষা ৫৮

২০. প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবন না উদ্ভাবনের পর উপযোগিতা ৬০

২১. উদ্ভাবনে যুদ্ধ রেখেছে ধারাবাহিক অবদান ৬৩
২২. বৈষম্যহীন সমাজ থেকে অভিজাততন্ত্র ৬৬
২৩. বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ৭০
২৪. সমাজ বিবর্তনে জনসংখ্যা ও খাদ্য বন্টনের ভূমিকা ৭৩
২৫. আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দের কঠিন জীবনযাত্রা ৭৭
২৬. ঔপনিবেশিকদের গড়া গ্রেটার অস্ট্রেলিয়া ৭৯
২৭. চীনাদের চৈনিক হয়ে ওঠার গল্প ৮২
২৮. আফ্রিকার সন্তানরা ৮৫
২৯. মানবের ইতিহাস দর্শন ৮৮

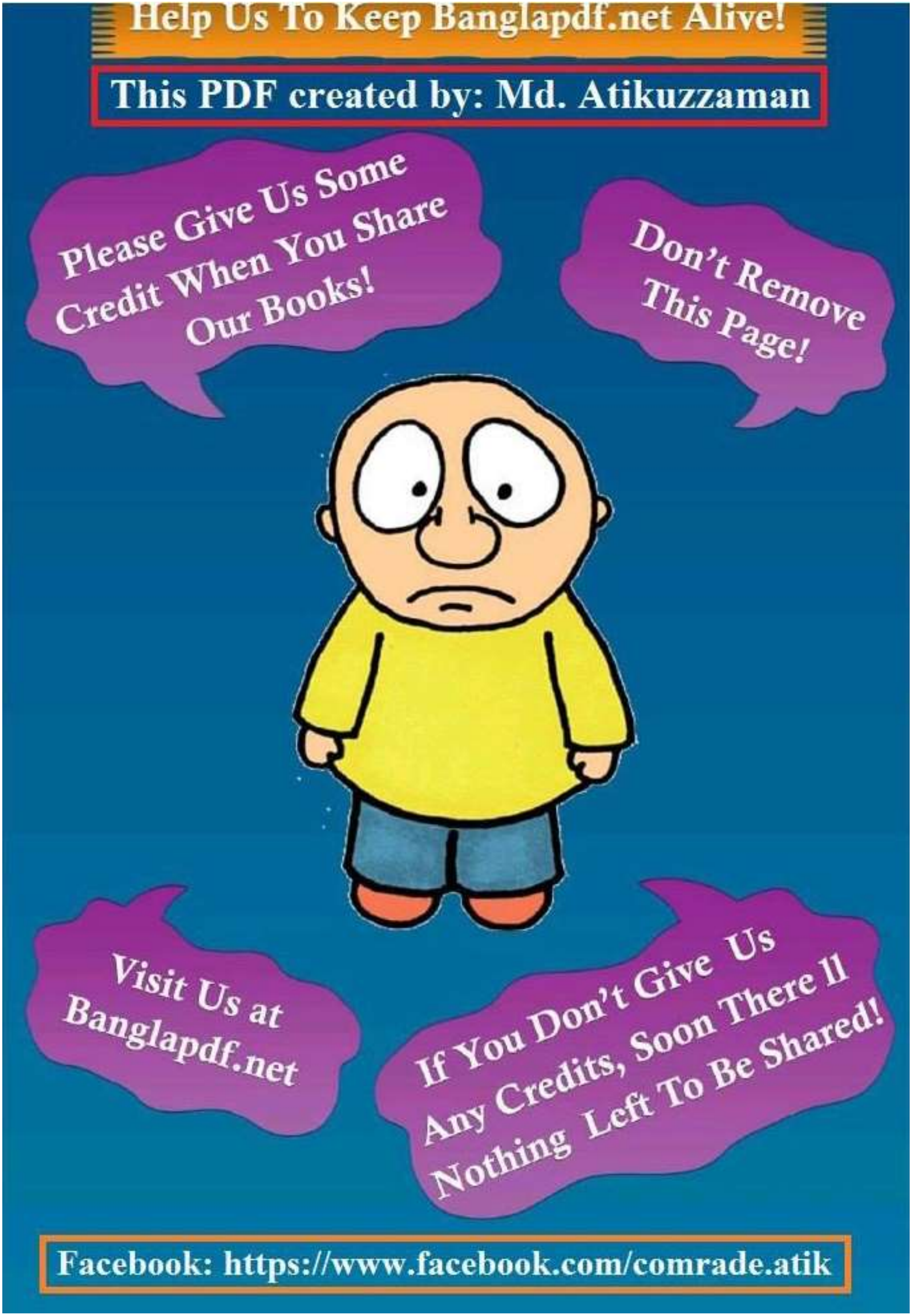

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
This PDF created by: Md. Atikuzzaman
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!
Facebook: https://www.facebook.com/comrade.atik

# পৃথিবীর ইতিহাস পেঁয়াজসদৃশ

হাতেগোনা কয়েকটি রাষ্ট্রই এ দুনিয়ায় কর্তৃত্ব চালাচ্ছে বাকিদের ওপর। বিস্তর বিশ্লেষণ হয়েছে এ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের কারণ নিয়ে; প্রতিনিয়ত হচ্ছেও। তবে মূলে রয়েছে ভৌগোলিক ও জলবায়ুর মতো প্রকৃতিগত অনুষঙ্গ। মানবসভ্যতার বিকাশ নির্ভরশীল এগুলোর ওপর, মানুষে মানুষে পার্থক্য তৈরিতেও ভূমিকা এর। শত শত বছর আগে কোনো অঞ্চল ছিল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, তাদের কর্তৃত্ব ছিল অন্যদের ওপর। বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে হয়তো তারাই আবার অন্যের বশ্যতা মানতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের বর্তমান অবস্থা ও বিকাশের পর্যায়গুলো উপলব্ধির জন্য তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় হাজার বছরের ইতিহাসের ওপর।

'গানস, জার্মস অ্যান্ড স্টিল' গ্রন্থে তুলে আনার চেষ্টা হয়েছে মানুষের বিগত ১৩ হাজার বছরের ইতিহাস। মহাদেশভেদে বিশ্বের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন কেন? এ প্রশ্নই এই আলোচনায় বড় উৎসাহ জুগিয়েছে। কারো অবশ্য মনে হতে পারে, এখানে অবশ্যই বর্ণবাদ বেশ বড় জায়গাজুড়ে আলোচনা হবে; আসলে মানুষের জাত-পাত এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। মূলত এখানে সামাজিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়গুলোর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। যথাসম্ভব অনুসন্ধান করা হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মৌলিক কার্যকারণগুলো।

বিশ্ব ইতিহাসের আলোচনায় ইউরেশিয়া (ইউরোপ ও এশিয়া) ও উত্তর আফ্রিকার সীমিত কিছু সমাজ ও সভ্যতাই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে বরাবর। অন্যান্য অঞ্চল, যেমন সাব-সাহারান আফ্রিকা, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি, প্যাসিফিক আইল্যান্ডের গুরুত্ব সেভাবে স্থান পায়নি। তার ওপর এ অঞ্চলগুলো আবিষ্কার হয় পশ্চিম ইউরোপীয়দের হাত ধরে। এ কারণে সেখানকার পুরনো ইতিহাস বেশি জানার সুযোগটাও কম। আবার ইউরেশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চেয়ে ঢের গুরুত্ব পায় পশ্চিমের সমাজ। এর নানা কারণ থাকতে পারে। মূলত লিখিতরূপে তথ্য রেকর্ডের প্রচলন শুরু হয় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এরও প্রায় অর্ধকোটি বছর আগে থেকে পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ শুরু। সে হিসাবে মানুষের বিবর্তনের প্রায় ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ তথ্যই আমাদের অজানা। এ সীমাবদ্ধতাই ইতিহাসের ঠিকুজি অনুসন্ধান কঠিন করে তোলে। সেই সঙ্গে এ কাজে তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ এসে হাজির হয়।

প্রথমত. এখন বিশ্বায়নের যুগ। এ সময়ে পশ্চিম ইউরেশিয়ার বদলে অন্যান্য এলাকার সম্প্রদায় নিয়ে বেশি আগ্রহ গবেষকদের মধ্যে। তাতে ভাবনার ক্ষেত্রগুলো বড় হয়ে উঠেছে। মানুষের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রবণতায় পরিবর্তন আসছে। অতীতে একতরফা প্রতিপ্রত্তি ছিল কিছু দেশ বা সম্প্রদায়ের। এখন সে কেন্দ্র সরে যাচ্ছে অন্যদিকে।

দ্বিতীয়ত. লিখিতরূপে তথ্য সংরক্ষণের প্রচলন অল্পদিনের, মাত্র তিন হাজার বছর আগের। এ কারণে অতীতের খুব বেশি অতীতে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব। আবার বিষয়টি এমনও নয় যে, ওই সময়ের আগে বিভিন্ন মহাদেশের স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থার তুলনা করা সম্ভব নয়। ইউরেশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কিছু সভ্যতায় লিখনশৈলীর আদিরূপ ওই সময়ে চোখে পড়ে। সেখানে গড়ে উঠতে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাও। এছাড়া ধাতব অস্ত্র তৈরি, পরিবহন ও কৃষিকাজে পশুপালনেরও প্রচলন শুরু হয়। অন্য অঞ্চলগুলোর সভ্যতায় এ অনুষঙ্গগুলোর উপস্থিতি ছিল না। দীর্ঘসময় পর এর কিছু কিছু আমেরিকা ও সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রচলন হয়। আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ায় সভ্যতার ছিটেফোঁটা ছিল না বললেই চলে। তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে অক্ষরজ্ঞানে এগিয়ে থাকার মাধ্যমেই শুরু হয় ইউরেশিয়ার আধিপত্য। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিম ইউরেশীয় সমাজের প্রতিনিধিরাই আধিপত্য প্রদর্শন শুরু করে।

তৃতীয়ত. পশ্চিম ইউরেশীয় সমাজের ইতিহাস রচনায় বড় একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে— 'সব সমাজ কেন সমানভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি? কিংবা উদ্ভাবনেও সমান ভূমিকা রাখতে পারেনি?' এ প্রশ্নের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সামনে চলে আসে; যার মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদ, বেনিয়াতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, প্রযুক্তি, এমনকি রোগজীবাণুও। ইউরেশীয়দের সংস্পর্শে আসার পরিণামে নতুন রোগজীবাণুর শিকার হয় অন্য মহাদেশের অন্য সমাজের লোকজন। কিন্তু অন্যের ওপর প্রভাব খাটানোর মতো বিষয়গুলো কেন শুধু পশ্চিম ইউরেশিয়ায়ই দেখা যেত? অন্য সমাজে এর উপস্থিতি কেন দেখা যায়নি?

আসলে তিনটি কারণই বিভিন্ন মাত্রার নিকটতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এসবের চূড়ান্ত কোনো ব্যাখ্যা নেই। কেন পুঁজিবাদ মেক্সিকোয় বিকাশ লাভ করেনি, বেনিয়াতন্ত্র (মার্কেন্টাইলিজম) সাব-সাহারান আফ্রিকায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চীনে, আধুনিক প্রযুক্তি উত্তর আমেরিকায় ও জীবনঘাতী জীবাণু আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হয়নি? কেউ যদি এ বিষয়কে প্রাকৃতিক বলে মেনে নেন, তাহলে তিনি চূড়ান্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন অস্বীকার করছেন। অনেকে ন্যূনতম ব্যাখ্যা ছাড়াই ধারণা করেন যে, কনফুসিয়ানিজমের চাপেই চীনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চর্চায় ঘাটতি দেখা যায়। বিপরীত দিকে গ্রিক কিংবা জুদাও ক্রিশ্চিয়ানদের দ্বারা এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, কনফুসিয়ানিজম ও জুদাও-খ্রিস্টবাদ কেন যথাক্রমে পশ্চিম ইউরেশিয়া ও চীনে প্রসার পায়নি? অনেকেই হয়তো এসবের ব্যাখ্যার প্রয়োজন এড়িয়ে যাবেন। অনেকের হয়তো জানাই নেই, ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কনফুসিয়ান চীনই কিন্তু পশ্চিম ইউরেশিয়ার তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে ছিল।

গভীর আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করলেও পশ্চিম ইউরেশীয় সমাজগুলোকে কেউ আলাদা করতে পারবেন না। মূল প্রশ্নটি তাদের সঙ্গে অন্য সমাজের পার্থক্যকে ঘিরেই। অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সব সমাজ সম্পর্কেই ধারণা নিতে হবে। তাহলেই কেবল পশ্চিম ইউরেশিয়ার সঙ্গে অন্য সমাজের তুলনামূলক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। পাঠক হয়তো ভাবছেন, এ আলোচনায় প্রথাগত ইতিহাস থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে। পশ্চিম ইউরেশিয়ার তুলনায় পৃথিবীর অন্য সমাজকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের সমাজগুলোরও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কোনো এক সমালোচকের মতে, এ আলোচনায় পৃথিবীর ইতিহাসকে দেখা হয়েছে পেঁয়াজের মতো করে। হালের পৃথিবী পেঁয়াজের বাইরের খোসা। তা ছাড়াতে থাকলেই ইতিহাসের ভেতরে প্রবেশ করা যাবে। জানা যাবে মূল বিষয়।

হ্যাঁ, পৃথিবীর ইতিহাস আসলেই পেঁয়াজের মতো। কিন্তু এর আবরণগুলো খসানো সত্যিই কঠিন; চ্যালেঞ্জিংও। এ কাজের প্রয়োজন এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই। ভবিষ্যৎ বিকাশধারা বুঝতে হলে জানতে হবে ইতিহাসও।

# ইয়ালির প্রশ্নে পিছিয়ে পড়া সমাজের কৌতূহল

স্থান-কাল-পাত্রভেদে ইতিহাসের গতিবিধি নানাভাবে পরিবর্তন হয়েছে। সর্বশেষ বরফ যুগের পর ১৩ হাজার বছরে সাত মহাদেশের হাজারো সমাজ নানা আঙ্গিকে বিকাশ লাভ করে। বিশ্বের কিছু অংশ বিকশিত হয় শিক্ষিত লোকজনের হাত ধরে শিল্পায়নের মাধ্যমে, যারা ধাতুর তৈরি নানা যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখে। আবার কোনো সমাজ গড়ে ওঠে নিরক্ষর ব্যক্তির কৃষিকাজের মাধ্যমে। আর কিছু সমাজ প্রস্তর যুগের মতো পাথুরে অস্ত্র প্রয়োগে কৃষিভিত্তিক সমাজ তৈরি করে। হাজার বছর আগের ওই ব্যুৎপত্তিই বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে, যার অনেক বিষয় এখনকার বিজ্ঞজনরা উপলব্ধি করতে পারেন।

যে সমাজের পূর্বসূরিরা ধাতব অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, সে সমাজই এখন অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে। অতীতের ওই কারণই বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। তবে এর কারণ অনির্ধারিত ও বিতর্কিত। এ হতবুদ্ধিকর বিষয় নিয়ে ২৫ বছর আগে প্রথমবারের মতো প্রশ্নের মুখে পড়েন লেখক ও বিজ্ঞানী জ্যারেড ডায়মন্ড। তা ছিল নিউ গিনির এক বাসিন্দার নিতান্তই সাধারণ ব্যক্তিগত কৌতূহল।

১৯৭২ সালের দিকে নিউ গিনিতে থাকতেন ডায়মন্ড। ওই বছরের জুলাইয়ের কোনো একদিন দেশটির গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এক দ্বীপের বালুকাবেলায় হাঁটছিলেন। সেখানে নিউ গিনির এক রাজনীতিবিদ ইয়ালির সঙ্গে তার অনেকক্ষণ কথা হয়। হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোনো ইয়ালি তাকে প্রশ্ন করেন নানা বিষয়ে। তার প্রথম প্রশ্ন নিউ গিনিতে জ্যারেড ডায়মন্ডের কাজ নিয়ে; অর্থাৎ পাখি নিয়ে গবেষণার কারণ। তার পরের প্রশ্নই উন্নত দেশগুলোর বিপরীতে নিউ গিনির অবস্থান নিয়ে। ২০০ বছরে ইউরোপীয়রা কীভাবে নিউ গিনিতে উপনিবেশ তৈরি করে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ইয়ালি।

ইয়ালি ও ডায়মন্ড দুজন দুই ধরনের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিতর্কিত। তার পরও দুজনের কথোপকথন এগিয়ে যায়। ২০০ বছর আগেও নিউ গিনির লোকজন ‘প্রস্তর যুগের বাসিন্দা’ ছিল। ইউরোপীয়রা যেখানে হাজার বছর আগে পাথরের তৈরি সরঞ্জামকে বিদায় জানায়, সেখানে কিছুদিন আগেও তা ব্যবহার করত নিউ গিনির বাসিন্দারা। তারা এলোমেলোভাবে বসসবাস করত। ছিল না কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব। শ্বেতাঙ্গরা আসার পর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। একই সঙ্গে আনে ধাতব সরঞ্জাম, যার তাৎপর্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনুধাবন করে নিউ গিনির নাগরিকরা। এসব সরঞ্জামের মধ্যে ছিল কুঠার থেকে দিয়াশলাই, চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে কাপড়, কোমল পানীয় ও ছাতা। আরো কত কী! নিউ গিনির অধিবাসীদের কাছে এসব শ্বেতাঙ্গ সরঞ্জাম এককথায় ‘কার্গো’ নামে পরিচিত।

অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা নিউ গিনির বাসিন্দাদের ‘আদি যুগের’ বলে মনে করেন। ১৯৭২ সালেও নিউ গিনির নাগরিকরা শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের ‘মাস্টার (প্রভু)’ নামে ডাকত। তত্কালীন রাজনীতিবিদ ইয়ালি চেয়েও অনেক বেশি ভালো জীবন যাপন ছিল শ্বেতাঙ্গদের। ইয়ালির মনে সবসময় একটা প্রশ্নই উঁকি মারত। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গকেই তিনি তার কৌতূহলের অংশ করে নিতে চাইতেন। তার ওই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় জ্যারেড ডায়মন্ডকেও। ‘তোমরা সাদা চামড়ার মানুষরা এত এত কার্গো বানিয়েছ। সেগুলো আবার নিউ গিনিতেও এনেছ। কিন্তু আমাদের মতো কালো মানুষের নিজস্ব কোনো কার্গো নেই কেন?’ এটাই ছিল ইয়ালির প্রশ্ন।

ইয়ালির জীবনযাত্রার মতোই সহজ ছিল তার প্রশ্ন। ওই সময়ও গড়পড়তা নিউ গিনিয়ান ও গড়পড়তা ইউরোপীয় বা আমেরিকানের জীবনযাত্রায় ছিল দুস্তর পার্থক্য। ইয়ালির প্রশ্ন খুবই সাধারণ। কিন্তু তার উত্তর দেয়া ভীষণ কঠিন। ওই মুহূর্তে আমার কাছে উত্তর ছিল না। ইতিহাসবিদরাও এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কখনই একমত হবেন না। ইয়ালির সঙ্গে যখন ডায়মন্ডের বাহাস চলে, তখন তিনি আরো অনেক কিছু নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। কাজ করতেন মানুষের বিবর্তন, ইতিহাস ও ভাষাতত্ব নিয়ে। ইয়ালির সঙ্গে দেখা হওয়ার ২৫ বছর পর ডায়মন্ড ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মাঠে নামেন।

ইয়ালির ছোট্ট প্রশ্নকেও অনেক বড় করে দেখার সুযোগ রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আধুনিক পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্যকেও মূল্যায়ন করা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকানরা এখনো সম্পদ ও শক্তিতে বিশ্ব শাসন করছে। অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে আফ্রিকানদের বৈশিষ্ট্য আলাদা। তারা কর্তৃত্বকারী ইউরোপীয়দের হটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শক্তি ও সক্ষমতায় এখনো হাজার গুণ পিছিয়ে। আবার অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও দক্ষিণ অঞ্চলের আফ্রিকার আদিবাসীরা স্বদেশ হারিয়েছে। উপরন্তু তারা ঔপনিবেশিকদের অধীন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তো হারিয়েই গেছে।

ইয়ালির প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে কয়েকশ বছর পেছন ফিরে তাকাতে হবে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে উপনিবেশবাদের গোড়াপত্তন। ওই সময় নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজগুলোয় স্বতন্ত্র প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার সমাজগুলোয় ধাতুর ব্যবহার বাড়ে। তারা মূলত শিল্পায়নের পটভূমি তৈরি করে। আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যে অ্যাজটেক ও ইনকারা পাথরে তৈরি অস্ত্রে রাজ্য শাসন করে। সাব-সাহারান আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে ছিল লোহার রাজত্ব। অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি, আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক অঞ্চলের লোকজন শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবেই জীবন ধারণ করে। সেখানকার সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জীবনধারণের নানা কাজে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। তত্কালীন পার্থক্যই এখনকার বৈষম্যের ভিত হিসেবে কাজ করেছে। তখন যারা ইস্পাত বা ধাতু ব্যবহারে এগিয়ে ছিল, তারাই পাথর ও কাঠ ব্যবহারকারীর ওপর সর্দারি ফলাচ্ছে। আরো অতীতে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে নানা সমাজের বৈষম্যের মৌলিক দিকগুলো।

এ আলোচনার মূল বিষয় ইতিহাস ও এর পটভূমি। এতে বিপরীতমুখী দুই সমাজের বিবর্তন উঠে এসেছে। তাদের এ পার্থক্য গড়ে দিয়েছে যুদ্ধ, মহামারী ও গণহত্যা। শত শত বছর পরও এর সমাপ্তি ঘটেনি। নানাভাবে এখনো রয়েছে এক সমাজের ওপর অন্য সমাজের প্রভাব ও কর্তৃত্ব। এমনকি তা দেখা যায় ভাষার ক্ষেত্রেও। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাতের

পাশাপাশি দেখা যায় ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন। বর্তমান পৃথিবীতে যে ছয় হাজার ভাষা টিকে আছে, তারও কিছু কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। যে গোষ্ঠীর ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রায় সবাই ইংরেজি, চীনা বা রুশ ভাষায় নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যেও রয়েছে ইয়ালির প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন উত্তর।

সর্বশেষ বরফ যুগের আগ পর্যন্ত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় সব মহাদেশের সব মানুষ একটা সময় শিকারি-সংগ্রাহক ছিল। ১১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহুমাত্রিক গতিতে বিভিন্ন সমাজ বিকাশ লাভ করে। এর ফলেই প্রাযুক্তিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য গড়ে ওঠে। ৫০০ বছর আগেও রেড ইন্ডিয়ানরা (আমেরিকার আদিবাসী) শিকারি-সংগ্রাহক ছিল। এ সময় নাগাদ ইউরেশিয়া, আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও সাব-সাহারান আফ্রিকায় কৃষি, পশুপালন, ধাতুবিদ্যা ও রাজনৈতিক কাঠামো পূর্ণতা পায়। যেভাবেই হোক, সভ্যতার মৌলিক বিষয়গুলো ইউরেশিয়ায়ই প্রথম দেখা যায়।

# গ্রেট এপ থেকে মানুষ

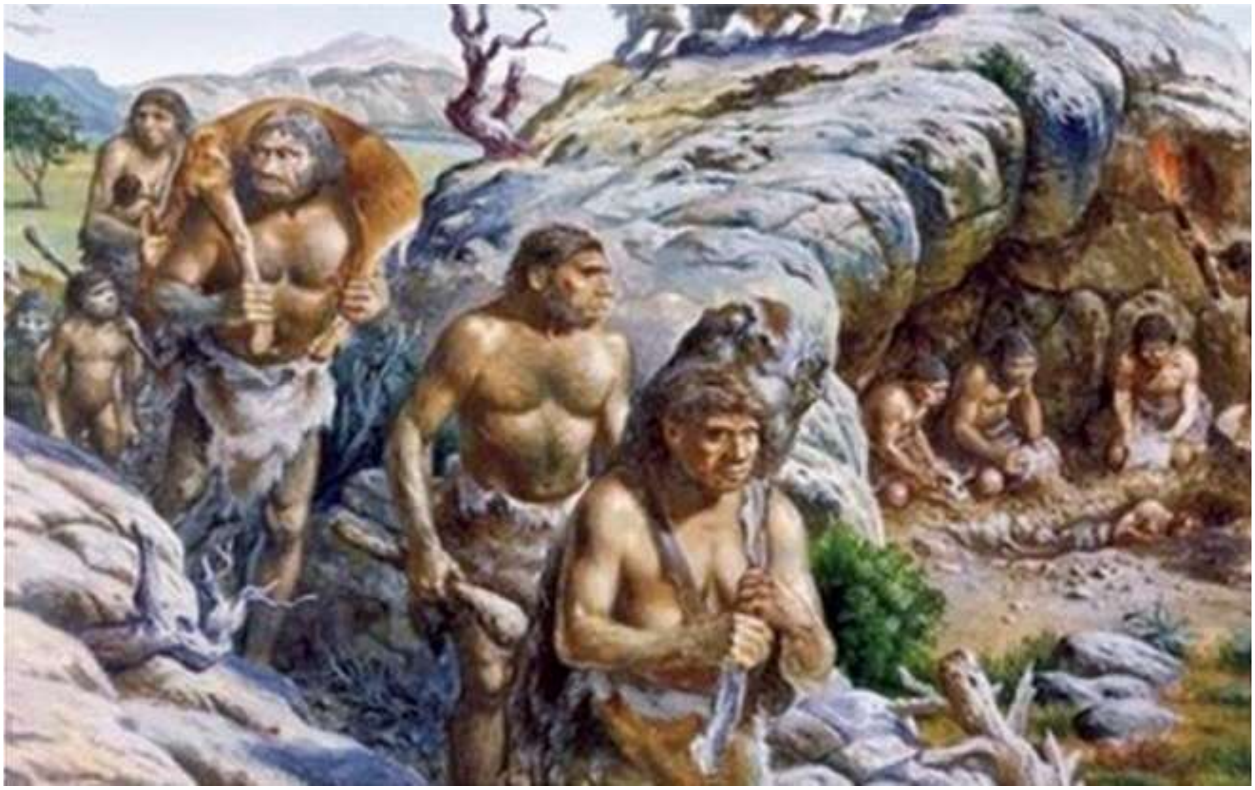

পৃথিবীর সব মহাদেশে সভ্যতার বিকাশ যুগপৎ ঘটেনি। কাজেই তুলনামূলক মূল্যায়নটা দুরূহ, অসম্ভবও বটে। তবে তুলনামূলক বিচারের একটা সময়কাল যদি ঠিক করে নিতেই হয়, তাহলে খ্রিস্টপূর্ব ১৩ হাজার বছর থেকে শুরু করা যেতে পারে। ওই সময় কিছু অঞ্চলে গ্রামের ধারণা বিকশিত হতে থাকে। এরও কয়েক হাজার বছর পর পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রচলন ঘটতে থাকে পশুপালনের। মানুষের জীবনযাত্রায় ওই সময় থেকে যে পার্থক্যের সূচনা হতে থাকে, তা-ই হাজার হাজার বছর পর অনেক বড় পার্থক্য হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তী হাজার হাজার বছরে সে পার্থক্য আরো ফুলেফেঁপে ওঠে। ওই বিবর্তনের ইতিহাস জানা থাকলে ইয়ালির প্রশ্নের উত্তরটা জানা সম্ভব হবে। তার আগে জানা দরকার বিভিন্ন মহাদেশে মানুষের দৈহিক বিবর্তনের ধরন।

বিবর্তনের ধারায় তিন ধরনের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মিল রয়েছে, যা গ্রেট এপ থেকে উদ্ভূত। এগুলো হলো গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও পিগমি শিম্পাঞ্জি। জীবাশ্ম তথ্য বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, আফ্রিকায়ই মানুষের বিবর্তন শুরু হয়। ৭০ লাখ বছর আগে সেখানে মানুষের বিবর্তন হতে শুরু করে, অর্থাৎ পশু থেকে আলাদা হতে থাকে। ওই সময় আফ্রিকায় এপ থেকে বিবর্তন হয়ে আধুনিক সময়ের গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও মানুষের বিকাশ হয়।

গ্রেট এপের উত্তরসূরিরা আফ্রিকায়ই বিচরণ করত। এ মহাদেশে জীবাশ্ম নমুনা থেকে জানা যায় এ তথ্য। ধারণা করা হয়, ৪০ লাখ বছর আগে মানুষের বিবর্তন বিশেষ গতি লাভ করে। এ সময় খুব দ্রুত এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ২৫ লাখ বছর আগের আদি মানুষের শরীর ও মগজের আকার বড় হতে শুরু করে। এ প্রাক-মানুষের এক প্রজাতি হোমো ইরেক্টাস। নানা পর্যায় পেরিয়ে ১৭ লাখ বছর আগে তাদের উদ্ভব ঘটে।

হোমো ইরেক্টাসই পরিবর্তিত হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্সে। এ আদি হোমো স্যাপিয়েন্সও শারীরিক গঠনে আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। কঙ্কালের নানা দিকে ছিল মূল পার্থক্য। মস্তিষ্কের আকারও ছিল খানিকটা ছোট। আচার-ব্যবহার একেবারেই আলাদা। তারা নামকাওয়াস্তে অস্ত্র ব্যবহার করত, যেগুলো ছিল পাথরের তৈরি। এখনকার সময় হয়তো বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরাও ওই অস্ত্রগুলোকে একটুও পাত্তা দেবে না।

পাঁচ লাখ বছর আগে আদি মানুষ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখে, তা হলো আগুনের ব্যবহার। এখনকার মানুষ আদি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে তেমন কিছুই পায়নি, প্রাকৃতিকভাবে কঙ্কালে কিছু সাদৃশ্য ছাড়া। এছাড়া কিছু পাথরের অস্ত্রও পাওয়া গেছে।

লাখ লাখ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় মানুষের পা পড়েনি। বিরানভূমি ছিল আমেরিকাও। দূর-দূরান্তে যাওয়ার কৌশল না জানায় আফ্রিকায়ই সীমিত থাকে মানুষের আদি পুরুষের বিচরণ। এর পর তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ইউরেশিয়ায়।

পাঁচ লাখ বছর আগে আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ কঙ্কালের গঠনের দিক থেকে আলাদা হতে শুরু করে। ৪০ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের বাসিন্দাদের শারীরিক গঠনে ভিন্নতা আসে। তাদের কেউ নিয়ানডারথাল, কেউ হোমো নিয়ানডারথালেনসিস নামে পরিচিত। অনেক ব্যঙ্গচিত্রে এ সময়কার মানুষকে গুহাবাসী ও হিংস্র হিসেবে দেখানো হয়। বাস্তবে তারা হয়তো যথেষ্ট সভ্য ছিল। অসুস্থকে সেবা দেয়া, মরদেহ সমাহিত করার মতো সভ্য রীতি রেখে গেছে সে সময়কার মানুষ। অবশ্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র তখন পর্যন্ত যথেষ্ট ধারালো হয়ে ওঠেনি।

৫০ হাজার বছর আগে মানুষের ইতিহাসে ব্যাপক অগ্রগতি দেখা দেয়। একে আখ্যায়িত করা হয় ‘গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড’ হিসেবে। এ উন্নতির উত্কৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায়। পাথরের অস্ত্রগুলো আরো ধারালো হয়ে ওঠে। উট পাখির ডিমের শক্ত খোলস থেকে গয়না তৈরি করতে শেখে তারা। এ ধরনের উন্নতি দেখা যায় পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে; আরো ১০ হাজার বছর পর দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন সমাজে। তখনকার মানুষের শারীরিক গঠন ও চলাফেরার সঙ্গেই এখনকার মানুষের সন্তোষজনক মিল পাওয়া যায়। ওই মানুষের নাম ছিল ক্রো-ম্যাগনন।

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ক্রো-ম্যাগননদের সম্পর্কে পাওয়া নানা তথ্যে অভিভূত হতে থাকেন বিজ্ঞানীরা। ক্রো-ম্যাগননরা পাথরের পাশাপাশি হাড়ের অস্ত্র তৈরি করতেও শেখে। কোনো উপাদানকে পছন্দমতো আকৃতি দেয়ার মতো কৌশল রপ্ত করে। মাছ ধরার বড়শি তৈরি হয় তাদের হাতে। এমন আরো অনেক নিদর্শনই অজানা ছিল তাদের পূর্বসূরিদের। তারা বিভিন্ন কাজের জন্য বিচিত্র সব অস্ত্র তৈরি করে। এসবের মধ্যে ছিল কাপড় সেলাইয়ের সুই ও মোটা চামড়া ছেদ করার মতো হাতিয়ার। এগুলো ছিল একটি মাত্র বস্তুনির্ভর যন্ত্র। তারা দুটি বস্তু জোড়া দিয়েও অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। যেমন হারপুন, বর্শা ও তীর-ধনুক। বন্দুকের মতো আধুনিক অস্ত্রের অধিকাংশই তীর-ধনুকের বংশধর। এর সুবাদে শিকার করা যেত নিরাপদ দূরত্ব থেকে। মানুষের শিকারে পরিণত হতে থাকে হাতি কিংবা গণ্ডারের মতো অতিকায় প্রাণীও। এছাড়া লম্বা রশি, সুতা ও ফাঁদ তৈরির কৌশল উদ্ভাবন হয়। এতে আগের চেয়ে সহজ শিকারে পরিণত হয় মাছ ও পাখি। মানুষের খাদ্যতালিকায় যোগ হয় নতুন উপাদান। ঘরবাড়ি নির্মাণ ও জামাকাপড় বানানোর কৌশল জানার সুবাদে মানুষ তীব্র শীতপ্রবণ এলাকায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। অলঙ্কার গড়া ও মরদেহের সত্কার করার মধ্য দিয়ে মানুষের নান্দনিক মানসিকতা ও আত্মিক উন্নয়নের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রো-ম্যাগননদের জীবনের যে অংশ এখনকার সময় পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার অন্যতম গুহাচিত্র, মূর্তি ও বাদ্যযন্ত্র। এগুলো এখনকার যুগেও দারুণ শিল্পকর্ম হিসেবে মূল্যায়িত। ওই সময় কিছু শিল্পকর্ম সংরক্ষিত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের

ল্যাসকৌতে। এর মধ্যে রয়েছে প্রমাণ সাইজের ষাঁড় ও ঘোড়ার ছবি। কেউ সেখানে গেলে বুঝতে পারবেন, ক্রো–ম্যাগননরা চিন্তাভাবনায় এখনকার মতোই ছিল। তাদের শারীরিক গঠনও একই।

এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়, ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষের মধ্যে বড় উন্নতি দেখা গেছে। ৪০ হাজার বছর আগে ক্রো–ম্যাগননরা ইউরোপে আসে। তাদের কঙ্কাল, ব্যবহৃত অস্ত্র ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাদি সে সময় ইউরোপে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় উন্নত ছিল। তাদের আগমনের মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে ইউরোপ থেকে নিয়ানডারথালরা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। অবাক করা তথ্য হলো, এ নিয়ানডারথালরাই কয়েক লাখ বছর ধরে সমগ্র ইউরোপ অধিকার করে ছিল। ক্রো–ম্যাগননরা যে তুলনামূলক শক্তিশালী ছিল, তা বোঝা যায় তাদের টিকে থাকার মধ্য দিয়ে। ক্রো–ম্যাগননরা নিয়ানডারথালদের মাঝে রোগের সংক্রমণ ঘটিয়েছে, হত্যা করেছে কিংবা অন্য কোনোভাবে তাদের বিলুপ্ত করেছে। এ কাজে তারা তুলনামূলক আধুনিক প্রযুক্তি, ভাষা ও তাদের উন্নত মগজ ব্যবহার করেছে।

# ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তন

চ্যাথাম আইল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের ৫০০ মাইল পূর্বের একটি দ্বীপ। দীর্ঘদিন ধরে এ দ্বীপেই থিতু ছিল মরিওরি আদিবাসীরা। সামাজিক সাম্যে বিশ্বাস রেখে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের এক রীতিতে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলেছিল তারা। তবে ১৮৩৫ সালের ১৯ নভেম্বর তাদের ওপর নেমে আসে নরকসম এক বিপর্যয়। ওইদিন বিশাল এক জাহাজে চড়ে ৫০০ মাওরি যোদ্ধা হাজির হয় চ্যাথামে; হাতে ছিল বন্দুক, গদা ও কুঠার। সপ্তাহ দুয়েক পর ৫ ডিসেম্বর তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আরো ৪০০ মাওরি। একযোগে মরিওরিদের ঘাঁটিতে হানা দিতে থাকে অনুপ্রবেশকারী মাওরিরা। স্থানীয়দের বাধ্য করতে থাকে দাসত্ব মেনে নিতে। যারা বশ্যতা অস্বীকার করে, প্রাণ হারাতে হয় তাদের। পর্যাপ্ত যোদ্ধা না থাকায় মাওরিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়তে পারেনি মরিওরিরা। গোষ্ঠীপতিদের এক সভায় সিদ্ধান্ত হয়, তারা মাওরিদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেবে; যেখানে গুরুত্ব পাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সম্পদ ভাগাভাগি করে সহাবস্থান। কিন্তু সে সুযোগও কপালে জোটেনি তাদের। সর্বশক্তি নিয়ে আঘাত হানতে থাকে মাওরি যোদ্ধারা; চার-পাঁচদিনের মধ্যেই কচুকাটা হয় বিপুল সংখ্যক মরিওরি। কারো কারো জায়গা হয় মাওরিদের উদরে। হ্যাঁ, নরমাংসভোজীরা তখনো ছিল।

আদিবাসী এ দুই গোত্রের মধ্যে সংঘাতের পরিণাম আগে থেকেই অনুমেয় ছিল। মরিওরিরা প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগ লাভ করে জীবন ধারণ করত। এককথায় তাদের বলা যায় শিকারি-সংগ্রাহক। জীব-জন্তু, মাছ শিকার এবং শস্য ও উদ্ভিদ সংগ্রহ করত তারা। এ কাজে ব্যবহার হতো খুবই মামুলি হাতিয়ার। অন্য জাতির সঙ্গে লড়াই করার কোনো তাগিদই ছিল না তাদের মধ্যে। কাজেই মারণাস্ত্র ব্যবহার কিংবা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার মতো নেতা— কোনো কিছুরই প্রয়োজন ছিল না মরিওরিদের। পরিণামে নাস্তানাবুদই হতে হয় তাদের। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের উত্তর থেকে আসা মাওরিরা ছিল যুদ্ধবাজ; যাদের ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দৃঢ় মনোবল।

মরিওরি ও মাওরি— এ দুই পক্ষের সংঘাত মূলত ইতিহাসের নানা সময়ের জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেরই এক উদাহরণ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দুর্বলের সব কেড়ে নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবী থেকেই হারিয়ে গেছে দুর্বল প্রতিপক্ষ। অথচ হাজার বছর আগে মাওরি ও মরিওরি— এ দুই জাতির পূর্বপুরুষ ছিল একই। দুই পক্ষই ছিল পলিনেশীয়। এক হাজার খ্রিস্টাব্দে নিউজিল্যান্ডে উপনিবেশ গড়ে তোলা পলিনেশীয় কৃষকদের বংশধররাই মাওরি। সেখান থেকেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় মাওরি ও মরিওরি নামে দুটি আলাদা জাতি। বিভক্তির পর থেকে সময়ের আবর্তে দুই পক্ষের বৈশিষ্ট্যের ব্যবধান বাড়তে থাকে। একসময় আলাদা দুটি দ্বীপে তাদের জীবনাচরণে প্রায় আপাদমস্তক পরিবর্তন দেখা যায়। মরিওরিরা পরিণত হয় শিকারি-সংগ্রাহকে আর মাওরিরা দক্ষ কৃষকে। দ্বিতীয় দলটি পরবর্তীতে পরিণত হয় ঔপনিবেশিক শক্তিতে।

তাদের বিপরীতমুখী জীবনধারা একসময় অনিবার্য সংঘাতের দিকে গড়ায়। তাদের মধ্যকার পার্থক্যের হেতু ও বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করে জানা সম্ভব, মহাদেশ থেকে মহাদেশে ইতিহাসের গতিপথ কেন বহুধা বিভক্ত। মরিওরি ও মাওরি একই পূর্বপুরুষের বংশধর হলেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বিকশিত হয়। একপর্যায়ে তারা একে অন্যের কথাই জানত না। পরে অস্ট্রেলিয়ার সিল শিকারি জাহাজের নাবিকের সূত্রে নিউজিল্যান্ডে খবর পৌঁছে— চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে সুন্দর এক দ্বীপ রয়েছে; যার আশপাশটা মাছ সংগ্রহের অসাধারণ উত্স। সেখানকার বাসিন্দা অল্প কয়েকজন; যারা যুদ্ধ করতে জানে না। এ তথ্য জানার পরই ৯০০ মাওরি হামলে পড়ে মরিওরিদের ওপর। পরিবেশ কীভাবে প্রভাব ফেলে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, সামাজিক ঐক্য ও যুদ্ধক্ষমতার মতো বিষয়ে, তা উপলব্ধিতে এ উদাহরণই যথেষ্ট।

পলিনেশিয়া অঞ্চলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় দেখা যায় নানা বৈচিত্র্য। সেখানে যেমন শিকারি-সংগ্রাহক ছিল, তেমনি ছিল কৃষিজীবী। সেখানকার কৃষকরা শূকর, কুকুর ও মুরগি পালন করতেও শেখে। কৃষিকাজের জন্য সেচ ব্যবস্থা ও পুকুর খনন করে মাছ চাষের দক্ষতাও অর্জন করে তারা। পলিনেশীয় সমাজে বেশির ভাগ গৃহস্থই ছিল কমবেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিছু দ্বীপে সামাজিক কাঠামোও ছিল। কয়েকটি দ্বীপের সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে সাম্য রক্ষারও চেষ্টা করা হতো।

হাজার বছর আগে অধিকাংশ মানুষের কাছেই পলিনেশীয় দ্বীপগুলো ছিল দুর্গম। প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জে নিউ গিনির উত্তরাঞ্চলের লোকজন পলিনেশীয় কিছু দ্বীপে পাড়ি জমায়। তারা ছিল কৃষক, জেলে ও সমুদ্রগামী নাবিক। পরবর্তী কয়েক শতকে তাদের পূর্বপুরুষরা প্রশান্ত মহাসাগরের বসবাসযোগ্য সব দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন দ্বীপে সংসার পাতার এ ধারাবাহিকতা পূর্ণতা পায় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে।

প্রায় দেড় হাজার বছর সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশির বুকে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলোয় জনবসিত শুরু হয়; যাদের পূর্বপুরুষ একই উৎসর। পলিনেশিয়ার বাসিন্দাদের আদি পুরুষরা ছিল একই সংস্কৃতির। তাদের ভাষা, প্রযুক্তি ও গৃহপালিত পশু চাষাবাদ পদ্ধতিও ছিল এক। এ কারণে পলিনেশিয়ার ইতিহাস বিশ্লেষণে ইতিহাসের প্রাকৃতিক পরীক্ষণ জানা যায়।

মরিওরিদের জীবনধারা থেকে ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশবাদের শিকার হওয়া সমাজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায়, চ্যাথাম আইল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের আলাদা পরিবেশ কীভাবে মরিওরি ও মাওরিদের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে।

চ্যাথামের ঠাণ্ডা জলবায়ুতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শস্য জন্মাত না। কাজেই অন্য জায়গা থেকে আসা ঔপনিবেশিকদের শিকারি-সংগ্রাহকে পরিণত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাদের শস্যভাণ্ডার ছিল না। কাজেই হাতিয়ার প্রস্তুতকারী, যোদ্ধা, আমলা কিংবা অন্য কাউকে সমর্থন দিতে পারত না। তাদের সহজ শিকার ছিল সিল, সেইলফিশ, সামুদ্রিক পাখি ও খালি হাতে ধরা যায় এমন মাছ। সেখান থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ না থাকায় চ্যাথামেই থিতু হয় মরিওরিরা। ছোট্ট দ্বীপে দুই হাজারের বেশি শিকারি-সংগ্রাহকের স্থানসংকুলান হতো না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তারা ছেলেশিশুদের নপুংসক করে রাখত। নানা সীমাবদ্ধতার পরিণামে মরিওরিরা সুসংগঠিত কোনো যোদ্ধা জাতি হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের ছিল না যথেষ্ট আধুনিক প্রযুক্তি কিংবা শক্তিশালী নেতৃত্ব।

বিপরীতে নিউজিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল (সেখানকার আবহাওয়া উষ্ণতর) ছিল কৃষিকাজের জন্য দারুণ জুতসই। সেখানে গড়ে ওঠে কৃষিভিত্তিক সমাজ। জনসংখ্যা বাড়তে থাকে অল্প সময়ের মধ্যেই। টিকে থাকার প্রয়োজন তাদের যুদ্ধ শেখায়। শেখায়

অন্যকে আক্রমণের কৌশল। তারা নির্মাণ কৌশলও রপ্ত করে। গড়ে তোলে দুর্ভেদ্য দুর্গ। আশপাশের দ্বীপগুলোয় বসতি স্থাপনের প্রয়োজনে তারা অন্যের ওপর হামলে পড়ে।

আগেই বলা হয়েছে, মাওরি–মরিওরি সংঘর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের সামান্য এক নমুনা। নিউজিল্যান্ড ও চ্যাথামের বাইরের অন্য দ্বীপগুলোর জলবায়ু, ভূপ্রকৃতিও ছিল আলাদা। পলিনেশিয়ার বিভিন্ন সমাজ গঠনে কমপক্ষে ছয়টি বিষয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে; সেগুলো হলো— দ্বীপের জলবায়ু, ভূমিরূপ, সামুদ্রিক সম্পদ, আকার, ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবেশী অন্য দ্বীপ থেকে দূরত্ব।

এসবের ওপর ভিত্তি করে পলিনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারিত হয়। সবচেয়ে কম ঘনত্ব ছিল চ্যাথামে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে পাঁচজন। টোঙ্গা ও সামোয়ায় ছিল ২১০–২৫০ জন। আনুটা উঁচু ভূমিতে জনঘনত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার ১০০ জনেরও বেশি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজবৈচিত্র্যের নগণ্য অংশ জানা যায় পলিনেশিয়ার নানা ঘটনা থেকে। ধরে নেয়া যায়, অন্য সভ্যতাগুলোর বিকাশেও ভূমিকা ছিল ওই ছয়টি বিষয়ের। একই ঘটনা কি অন্য মহাদেশেও ঘটেছিল? সেসব ঘটনার পরিণতিইবা কেমন ছিল?

# কাহামার্কার সংঘর্ষ: নতুন পৃথিবীতে ইউরোপীয় আগ্রাসন

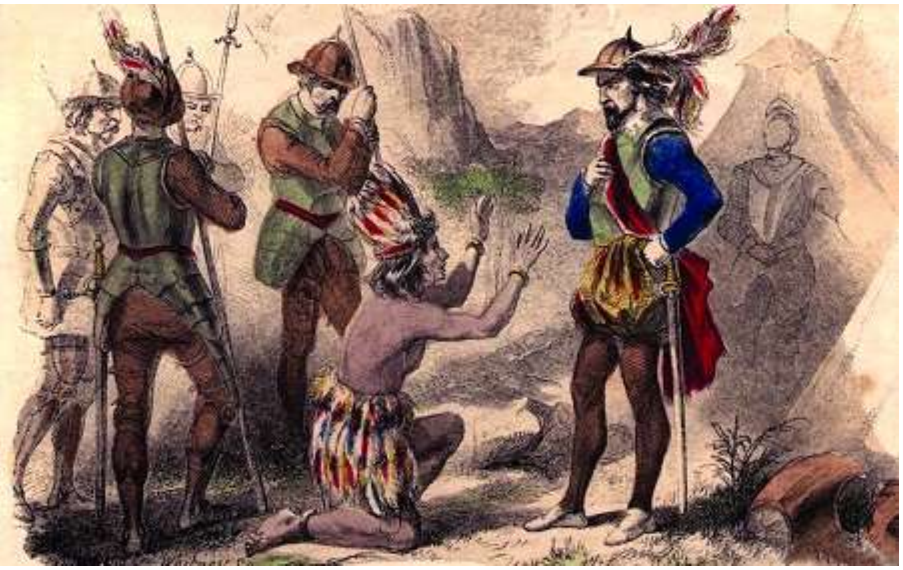

আধুনিক যুগে ‘নতুন পৃথিবীর’ (আমেরিকা অঞ্চলের অন্য নাম) জনমিতির পরিবর্তনে বড় নিয়ামক ছিল ইউরোপীয়রা। তাদের অভিযানে পৃথিবী থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় স্থানীয় আদিবাসীদের কোনো কোনো গোষ্ঠী। ওই অঞ্চলে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের বাসিন্দাদের আগমন ঘটে মূলত ১১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আলাস্কা, বেরিং প্রণালি ও সাইবেরিয়া হয়ে এ অঞ্চলে আগমন ঘটে অন্যদের। যে অঞ্চল দিয়ে তারা আমেরিকার গভীরে প্রবেশ করে, তার পার্শ্ববর্তী, এমনকি দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত নতুন ধারার কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে।

নতুন পৃথিবীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম আসে স্ক্যান্ডিনেভীয়রা। ৯৮৬ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে তারা নতুন পৃথিবীতে পাড়ি দেয়। এতে অবশ্য রেড ইন্ডিয়ানদের (আদিবাসী আমেরিকান) জীবনধারায় তাদের বড় কোনো প্রভাব পড়েনি। নতুন ও পুরনো— দুই পৃথিবীর সংঘর্ষ শুরু হয় ১৪৯২ সালের পর, যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা ‘আবিষ্কার’ করেন। ইউরোপীয় ও আদিবাসী আমেরিকান— এ দুয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বড় ঘটনা ঘটে ১৫৩২ সালের ১৬ নভেম্বরে। সংঘর্ষ বাধে ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা ও স্প্যানিশ যোদ্ধা ফ্রান্সিসকো পিজারোর মধ্যে। পেরুর উচ্চভূমি কাহামার্কায় যুদ্ধে নামে দুই পক্ষ।

একদিকে নতুন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও আধুনিক রাজ্যের সম্রাট আতাহুয়ালপা। অন্যদিকে রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের (যিনি স্পেনে রাজা প্রথম চার্লস নামে পরিচিত) প্রতিনিধি ফ্রান্সিসকো পিজারো। তত্কালীন ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল রোম। পিজারোর বাহিনীতে সৈনিক মাত্র ১৬৮ জন। সম্পূর্ণ নতুন অচেনা এক দেশে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসারও কেউ নেই। অন্যদিকে আতাহুয়ালপা ছিলেন নিজের রাজ্যেই; যেখানে ছিল তার লাখ লাখ প্রজা। কেবল সৈন্যদলেই ছিল ৮০ হাজারের বেশি সদস্য, যারা কিনা অন্য রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর দোর্দণ্ডপ্রতাপ জারি রেখে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে স্প্যানিয়ার্ডদের ধুলোয় মিশে যাওয়ার কথা। বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি।

দুই বাহিনীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের কয়েক মিনিটের মধ্যেই পর্যুদস্ত হন আতাহুয়ালপা। আটক হন পিজারোর হাতে। যে আতাহুয়ালপা ছিলেন সূর্যদেবতা (ইনকাদের কাছে), তিনিই কিনা সূর্য কিরণ ঢোকে না, এমন খুপড়ি ঘরে দীর্ঘ আট মাস বন্দি থাকেন। মানবেতিহাসের সর্বোচ্চ মুক্তিপণে তাকে মুক্তি দিতে সমঝোতা হয়। সে অনুযায়ী আতাহুয়ালপা ২২ ফুট দীর্ঘ

১৭ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট উঁচু একটি কামরাভর্তি স্বর্ণ পিজারোকে তুলে দেন! কিন্তু অঙ্গীকার রাখেননি পিজারো। হত্যা করেন আতাহুয়ালপাকে।

আতাহুয়ালপার পতনের মধ্য দিয়ে ইনকা সাম্রাজ্যের ওপর ইউরোপীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। সংখ্যায় নগণ্য হলেও রণসজ্জায় ইনকাদের চেয়ে ঢের এগিয়ে ছিল স্প্যানিশরা। ইনকা সম্রাটের মৃত্যুর পর চূড়ান্ত লড়াই বাধে দুই পক্ষের। এরই মধ্যে হাজার মাইল দূরের পানামা থেকে রসদ সহায়তা পৌঁছে স্প্যানিশদের কাছে। নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আরো ভয়ানক হয়ে ঝলসে ওঠে স্প্যানিশদের ইস্পাতের তরবারি।

আতাহুয়ালপার আটক ও খুনের ঘটনা সংঘাতপূর্ণ আধুনিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ ঘটনা একই ধরনের অন্য ঘটনারও প্রতিনিধিত্ব করে। আতাহুয়ালপার প্রাণসংহারের ঘটনা এসবের নমুনামাত্র।

দেবতুল্য আতাহুয়ালপা একজন স্প্যানিয়ার্ডের কাছে কেন নাকাল হলেন, তা নিয়ে কৌতূহল জন্মানো স্বাভাবিক। মূলত আদিবাসী আমেরিকান তথা রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বড় পার্থক্য ছিল যুদ্ধাস্ত্রে। ১৬ শতকে এসেও রেড ইন্ডিয়ানরা প্রস্তর যুগের পাথর, কুঠার, কাঠের গদা ও গুলতির মতো সনাতনী অস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যদিকে ইউরোপীয়দের ছিল ইস্পাতের তরবারি, বর্ম ও বন্দুকের মতো আধুনিক সরঞ্জাম। তার ওপর তাদের ছিল তাগড়া ঘোড়া।

আতাহুয়ালপার মৃত্যুর পর ইনকা রাজধানী কুসকোর দিকে অগ্রসর হন পিজারো। পথিমধ্যে আরো চার জায়গায় ইনকা প্রতিরোধের মুখে পড়ে স্প্যানিয়ার্ডরা। চারটি যুদ্ধে মাত্র ৮০, ৩০, ১১০ ও ৪০ জন করে স্প্যানিশ অশ্বারোহী ছিল। ইনকা দলে প্রতিটি যুদ্ধে হাজারের বেশি সৈন্য ছিল। অন্য আদিবাসী আমেরিকানরা এগিয়ে আসায় স্প্যানিশ জয়যাত্রা সহজ হয়। তবে তাদের মূল শক্তি ছিল মানসিক দৃঢ়তা, আধুনিক অস্ত্র ও তেজি ঘোড়া। তাদের স্বীয় শক্তিই আদিবাসী আমেরিকানদের মিত্র তৈরিতে সহায়তা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্প্যানিশদের রণদক্ষতাই আদিবাসী আমেরিকানদের কাছে টানে। কেননা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ বিজয়ীকে সমর্থন করতে চায়।

কাহামার্কার যুদ্ধে বারুদ, ইস্পাত ও ঘোড়ার ব্যবহার ইনকাদের হতবিহ্বল করে তোলে। নতুন ধরনের অস্ত্র দেখার অভিজ্ঞতা হয় ইনকাদের। এর পরের ছয় বছরে একাধিকবার স্প্যানিশদের প্রতিরোধের চেষ্টা হলেও আধুনিক রণসজ্জার কাছে হার মানে ইনকারা।

ইনকাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে স্প্যানিশরা যে বন্দুক ব্যবহার করে, তা সামলানো মোটেও সহজ ছিল না। কার্তুজ ভরে তা দাগাতে বেশ বেগ পেতে হতো সেনাদের। বাহিনীর সব সদস্যের কাছেও ছিল না আগ্নেয়াস্ত্রটি। পিজারোর বাহিনীর সংগ্রহে ছিল মাত্র ১২টি বন্দুক। মূলত এগুলোর উপস্থিতিই ইনকাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। ইস্পাতের তলোয়ার, বর্শা, খঞ্জরের মতো ধারালো অস্ত্রের ভূমিকা বন্দুকের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। আতাহুয়ালপার সেনাদলের গায়ে কোনো বর্ম থাকত না। কাজেই স্প্যানিশ ইস্পাতের সামান্য আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় হতো ইনকাদের দেহ।

বিপরীতে রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ছিল ভোঁতা মুগুর। এটা দিয়ে শত্রুর গায়ে কতটুকুইবা আঘাত করা যায়! তার ওপর স্প্যানিয়ার্ডদের দেহ ঢাকা থাকত ভারী বর্ম ও হেলমেটে। যুদ্ধের মাঠে অশ্বারোহীরা আরো সুবিধা পায়। পদাতিক সেনাদের তুলনায় তাদের দৃষ্টিসীমা থাকে বেশি। পেছন থেকে কেউ এসে সহজে হামলা করতে পারে না।

ইনকারা অবশ্য পরে অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কিছু কৌশল বের করে। যদিও খুব একটা কার্যকর ছিল না তা। স্প্যানিশ অশ্বারোহীদের ওপর হামলা চালাতে গিরিপথের দুই ধারে ওত পেতে থাকত ইনকারা। কিন্তু সামনাসামনি যুদ্ধে তারা কখনই শত্রুদের পরাজিত করতে পারেনি।

আতাহুয়ালপার প্রয়াণের পর ইনকাদের নেতৃত্বে আসেন সম্রাট মানকো। তার সেনাপতি ছিলেন কিজো ইয়ুবাংকি। ১৫৩৬ সালে তিনি লিমায় স্প্যানিশদের ওপর বড় আঘাত হানেন। রণভূমিতে প্রায় ৪০০ অশ্বারোহী স্প্যানিশ অসংখ্য ইনকার মুখোমুখি হয়। তবে প্রথম আঘাতেই প্রাণ হারান কিজো। এতে দিশা হারায় তার সেনারা। একইভাবে কুজকো শহরে স্বয়ং মানকো যুদ্ধে নামেন। তার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মাত্র ২৬ স্প্যানিশ ঘোড়সওয়ার।

দুই মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যকার এসব যুদ্ধে জয়-পরাজয়ে অস্ত্রের বাইরেও আরো কিছু বিষয়ের ভূমিকা ছিল। তা হলো নতুন ধরনের জীবাণুর সংস্পর্শে আসার ফলে সৃষ্ট মহামারী। ইউরোপীয়রা এসব রোগজীবাণুতে আগেই আক্রান্ত হয়েছিল। এর দরুন তাদের দেহে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়। তারা যখন অন্য মহাদেশগুলোয় ছড়িয়ে পড়তে থাকে, জীবাণুও তাদের সঙ্গী হয়। সংক্রামক জীবাণুর সংস্পর্শে এসে বিপর্যস্ত হয় আদিবাসী আমেরিকানরা। এসব রোগের মধ্যে ছিল গুটিবসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফাস, বিউবনিক প্লেগ প্রভৃতি। কেবল গুটিবসন্তের মহামারীতে নাকাল হয় অ্যাজটেক সাম্রাজ্য। অথচ ১৫২০ সালে সেখানে আক্রমণ করেও ব্যর্থ হয়েছিল স্প্যানিশরা।

ইউরোপীয়দের মাধ্যমে সূত্রপাত হওয়া নানা রোগ আমেরিকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে সংক্রমণ ঘটে, নিশ্চিহ্ন হতে থাকে তারা। আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে যতটুকু না ইউরোপীয়দের ভূমিকা, তার চেয়ে বেশি ছিল রোগবালাইয়ের। প্রাক-কলাম্বিয়ান (কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগের সময়) আমেরিকার আদিবাসীদের ৯৫ শতাংশই আটলান্টিকের ওপার থেকে আসা সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগে মারা পড়ে। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে ইউরোপীয়রা স্বশরীরে যাওয়ার আগেই রোগজীবাণু তাদের গুণ দেখিয়ে দেয়। একইভাবে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় রোগের বিস্তার ঘটে। ইউরোপীয়রাও কিছু ক্ষেত্রে অন্য মহাদেশে রোগজীবাণুর চ্যালেঞ্জে পড়ে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও নিউ গিনিতে ইউরোপীয়দের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সেখানকার রোগজীবাণু; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যালেরিয়া, পীত জ্বর প্রভৃতি।

পিজারোর হাতে আতাহুয়ালপা পরাভূত হওয়ার ঘটনায় কিছু প্রাথমিক কার্যকারণ জানা যায়। কেন আদিবাসী আমেরিকনরা নয়, বরং ইউরোপীয়রাই হানাদারের ভূমিকা নেয়। মূলত নৌপথে পারদর্শিতা, আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার, রাজনৈতিক কাঠামোসহ বেশকিছু বিষয় তাদের এগিয়ে রেখেছিল।

# ইস্পাত বারুদ মহামারীর

গোড়ার কথা।১৯৫৬ সালে কিশোর বয়সে কিছুদিন আমেরিকার পশ্চিমে মনটানা রাজ্যে কাটাই। সেখানে কাজ করি সুইজারল্যান্ড থেকে আমেরিকায় পাড়ি দেয়া কৃষক ফ্রেড হার্সির সঙ্গে। ১৮৯০ সালে কিশোর বয়সে ফ্রেড দক্ষিণ-পশ্চিম মনটানায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। অঞ্চলটিতে প্রথম খামার গড়েন তারাই। ওই সময়ও মনটানায় রেড ইন্ডিয়ানদের বসবাস ছিল; যারা মূলত শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবেই জীবন যাপন করত।

ফ্রেডের খামারে আমার বেশির ভাগ সহকর্মীই ছিল শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, আচরণে যাদের সবাই কাঠখোট্টা। পুরো সপ্তাহের আয় শেষ দিনে মদ গিলে সাবাড় করত তারা। সহকর্মীদের মধ্যে লেভি নামে একজন ব্ল্যাকফুট রেড ইন্ডিয়ান ছিল। আচরণ ও চিন্তাভাবনায় সে অন্যদের তুলনায় ছিল একেবারেই ভিন্ন। আমার দেখা প্রথম রেড ইন্ডিয়ান সে। কোনো এক রোববার সকালে হঠাত্ তার রুদ্রমূর্তি দেখি আমরা। শনিবার রাতে একটু মাত্রা ছাড়িয়ে পান করায় তার ওই অবস্থা হয়। লেভির চিল্লাচিল্লির মধ্যেই স্পষ্ট হয় ইয়াংকিদের (নতুন আমেরিকান) প্রতি রেড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা কতটা! ফ্রেডকে উদ্দেশ করে লেভির গালমন্দ— 'তুই ধ্বংস হ ফ্রেড হার্সি! আর ধ্বংস হোক তোকে সুইজারল্যান্ড থেকে ভাসিয়ে আনা জাহাজ।' অভিবাসী সাদা কৃষকদের আগমনে ক্রমেই কৃষিজমি হারাতে থাকে রেড ইন্ডিয়ানরা। যেভাবেই হোক সাদাদের আগ্রাসনে টিকতে পারেনি তারা।৭০ লাখ বছর আগে থেকে মানুষ বন্য ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে শেখে। ব্ল্যাকফুট রেড ইন্ডিয়ানরা ১৯ শতকেও একই ধারায় জীবন ধারণ করত। মূলত ১১ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করে। এর মধ্যে ছিল বন্য পশু ও উদ্ভিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে উত্পাদিত প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উপযোগ লাভ করা। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই কৃষিকাজের মাধ্যমে উত্পাদিত খাবার গ্রহণ করে। বিপরীত দিকে শিকারি-সংগ্রাহকের সংখ্যা না বললেই চলে। বর্তমানে যে হারে তারা হারিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে কয়েক দশকের মধ্যেই শিকারি-সংগ্রাহকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে নানা সময় সমাজভেদে মানুষ হাজারো উপায়ে খাদ্যোত্পাদন করতে শেখে। অনেক সমাজ নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করে, অনেকে প্রতিবেশী সমাজ থেকে ধার করে। কিন্তু এর সবকিছুই ভূমিকা রাখে বন্দুক, রোগজীবাণুর বিস্তার ও ইস্পাতের ব্যবহার নিশ্চিত করতে। খাদ্যোত্পাদনের সঙ্গেও গভীর যোগসূত্র রয়েছে কোনো সমাজের নিয়তি নির্ধারণের; যার প্রমাণ দেখেছি ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা পরাস্ত হওয়ার ঘটনায়; কিংবা ফ্রেড হার্সিরা যেভাবে লেভিদের হটিয়ে জায়গাজমি দখল করে নিচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটে।

খাদ্যোত্পাদন ও অন্য সমাজের ওপর কর্তৃত্ব— এ দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্রটা খুবই স্পষ্ট। প্রথম যোগসূত্র খুবই পরিষ্কার। যত বেশি খাবার তত বেশি মুখ। পৃথিবীর লাখো প্রজাতির উদ্ভিদ ও পশুর মধ্যে মানুষের খাওয়ার উপযোগী খুবই কম।

অধিকাংশেরই স্বাদ কটু, দুর্গন্ধযুক্ত, পুষ্টিহীন ও প্রক্রিয়াকরণ কষ্টসাধ্য। খুব অল্প সংখ্যক পশু ও উদ্ভিদই মানুষের খাওয়ার উপযোগী। এজন্য প্রয়োজন পড়ে সেগুলো বিশেষ যত্নের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে উত্পাদনের। আর তাতে অল্প জমিতে উত্পাদিত ফসলের ওপর নির্ভর করতে পারে অধিকাংশ মানুষ। শিকারি-সংগ্রাহকদের তুলনায় অল্প জায়গাজমি নিয়ে জীবন ধারণ করতে পারে কৃষিনির্ভর সমাজের মানুষ। এছাড়া পশুপালনের মতো কার্যক্রমও তাদের শিকারি-সংগ্রাহকের তুলনায় শক্তিশালী করে তোলে।

কৃষিনির্ভর সমাজের লোকজন শিকারি-সংগ্রাহকের তুলনায় অন্যদিক থেকেও সুবিধা পায়। এ সমাজের মানুষ যে পশু পালন করে, সেগুলো যেমন পুষ্টির উত্স, তেমনি কৃষিকাজেও সহায়ক। গরু, ঘোড়া, মোষ, ইয়াক একদিকে আমিষের উত্স, অন্যদিকে ক্ষেতখামারের কাজে মানুষের সহযোগী। যত দূর জানা যায়, এ ধরনের প্রথম সমাজ ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য ইউরোপের লিনিয়ারব্যান্ডকেরামিক (এলবিকে)। প্রথম দিকে হাতে জমি নিড়ানির কাজ সারত এ সমাজের কৃষকরা। পর্যায়ক্রমে তারা পশুর সহায়তা নিতে শেখে। কেবল নরম মাটিতে চাষাবাদে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। পশু পোষ মানাতে শেখার পর তাদের কাজের আওতাও বেড়ে যায়। ফসল ফলতে থাকে শক্ত মাটিতেও।

মূল কথায় আসা যাক, কৃষির ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন সমাজ। শিকারি-সংগ্রাহকরা যাযাবর হয়ে শত শত মাইল এলাকায় ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু কৃষকদের ফসলের জন্য নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় অপেক্ষা করতে হয়। তাদের আটকা থাকতে হয় একই এলাকায়। ঘন ঘন সন্তান জন্ম দেয়ার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বড় হয়ে উঠতে থাকে এ সমাজগুলো। বিপরীতে যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহকরা এক জায়গায় স্থির থাকত না। তারা অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন জায়গায় স্থানান্তর হতো। এ কারণে কোলে-পিঠে ছেলেপুলে বয়ে বেড়ানো ছিল বিশাল ঝামেলার কাজ! এ সমাজের দম্পতিরা তাই সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া সীমিত করে রাখে। শিশুর বয়স অন্তত চার বছরে না গড়ানো পর্যন্ত নতুন জায়গায় যাওয়া মুশকিল। নানাভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের এ প্রবণতা তাদের জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়।

শিকারি-সংগ্রাহকদের তুলনায় আরেক দিকে এগিয়ে কৃষিনির্ভর সমাজ। তা হলো ভবিষ্যতের জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্য সংরক্ষণ। এর হাত ধরেই গড়ে ওঠে রাজনৈতিক কাঠামোও। যারা সরাসরি খাদ্যোত্পাদনে যুক্ত নয়, তাদের জন্য সেখান থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। শিকারি-সংগ্রাহক সমাজে পুরুষদের দিনের বেশির ভাগ সময়ই কেটে যেত খাদ্য সংগ্রহের পেছনে। তার ওপর এ খাদ্য তারা জমিয়েও রাখতে পারত না। এ সমাজ ছিল সমতাভিত্তিক। কৃষিনির্ভর সমাজে খাদ্য সংরক্ষণের সুবিধা কাজে আসত অন্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রেও। ফলে নানাভাবেই এগিয়ে ছিল কৃষিনির্ভর সমাজ।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে কিছু কিছুর ব্যবহার ছিল যুদ্ধক্ষেত্রেও; যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ঘোড়া। পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইউরেশীয়রা যেভাবে অন্যদের কচুকাটা করেছে, তাতে বড় সহায়ক ছিল কষ্টসহিষ্ণু প্রাণীটি। স্প্যানিশ সেনাপতি পিজারোর নেতৃত্বে মাত্র ১৬০ জন সেনা যেভাবে আতাহুয়ালপার ৮০ হাজার সদস্যের ইনকা বাহিনীকে পরাস্ত করে, তাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল হাজার মাইল পাড়ি দেয়া প্রাণীগুলোর।

উদ্ভিদ ও পশু নিজের মতো লালন-পালন করার অর্থ বেশি বেশি খাবারের উত্স ও জনঘনত্ব। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক কেন্দ্রে বসতি স্থাপন, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রযুক্তিগত উত্কর্ষের জন্য অপরিহার্য ছিল খাবার জোগাড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এ কারণে গৃহপালিত পশু ও চাষযোগ্য উদ্ভিদই ভবিষ্যত্ নির্ধারণে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবরণ থেকেই জানা যায়, কেন বড় বড় সাম্রাজ্য, অক্ষরজ্ঞান ও ইস্পাতের সরঞ্জাম ইউরেশিয়ায় সবার আগে উত্পত্তি; কেনইবা অন্য মহাদেশের সমাজগুলো পিছিয়ে পড়েছিল। ঘোড়া ও উটের সামরিক ব্যবহারও এগিয়ে রাখে কিছু সমাজকে। পশু থেকে উদ্ভূত রোগজীবাণুও পরোক্ষ সহায়তা করে তাদের। তাই খাদ্যোত্পাদনের সঙ্গে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপনের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

# হ্যাভস ও হ্যাভ-নটসদের বৃত্তান্ত

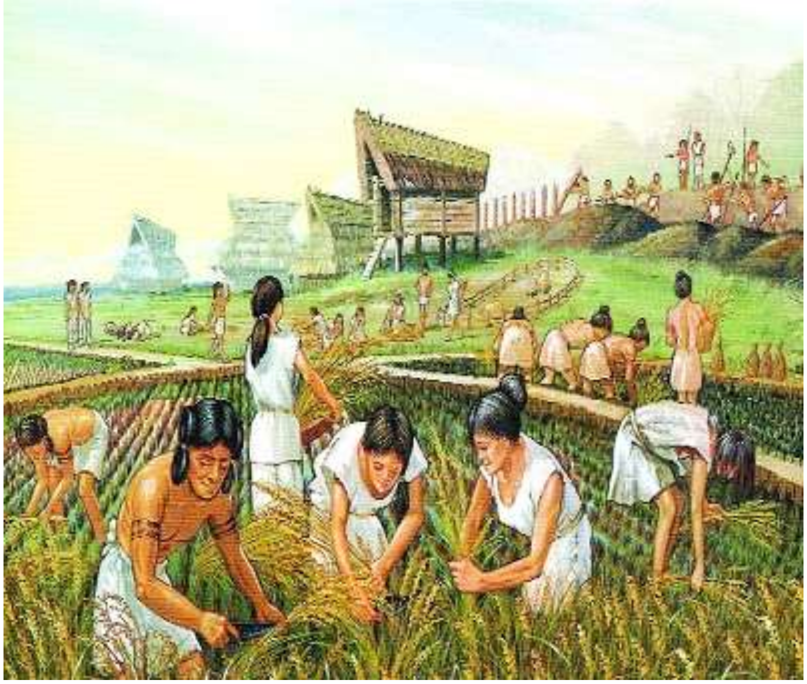

ক্ষমতাশালী ও দুর্বল সমাজের সাংঘর্ষিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে মানুষের ইতিহাস। পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, কৃষিকাজের সুফলভোগী ও বঞ্চিত— এ দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য এবং ঘটেছেও তাই। পৃথিবীর সব প্রান্তে একই গতিতে খাদ্য উত্পাদনের কৌশল বিকশিত হয়নি। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই অনেক অঞ্চলে শস্য উত্পাদন সম্ভব ছিল না। যেমন উত্তর আমেরিকার আর্কটিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে শস্য উত্পাদন ও পশুপালনের কোনো চর্চাই গড়ে ওঠেনি। একই সময় অবশ্য ইউরেশিয়ার আর্কটিকে হরিণ পালন করা হতো। আবার জলের দুষ্প্রাপ্যতায় অনেক স্থানে কৃষির প্রচলন সম্ভব ছিল না। যেমন মধ্য অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে কৃষিকাজের পার্থক্য গড়ে উঠেছে, তা বেশ আগ্রহোদ্দীপক। কিছু এলাকায় স্বাধীনভাবেই গড়ে ওঠে কৃষিকাজের কৌশল। সেখানকার অধিবাসী স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উদ্ভিদ ও পশু লালন-পালন করত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য দেশ বা অঞ্চল থেকে চাষাবাদ কৌশল আমদানির দেখা মেলে। খাদ্য উত্পাদনে কিছু সমাজের মানুষ কেন অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল? কেন আরেক গোষ্ঠীর সহায়তা ছাড়া কোনো অঞ্চল কৃষিকাজে দক্ষ হয়ে ওঠেনি? কেন আবার কেউ কেউ নিজ অঞ্চলের পশুকেও পোষ মানাতে পারেনি? এমন নানা প্রশ্ন মনে উঁকি দেয়াই স্বাভাবিক।

যে অঞ্চলের লোকজন স্বপ্রণোদিত হয়ে খাদ্য উত্পাদন করে চলছিল, সেখানেও ছিল নানা বৈচিত্র্য। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের চেয়ে হাজার বছর আগে পূর্ব এশিয়ায় কৃষিকাজের বিকাশ ঘটে। পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় তো কখনই এর বিকাশ ঘটেনি। প্রাগৈতিহাসিক কিছু অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজের কৌশল শেখে অন্য সমাজের কাছ থেকে। এ প্রবণতায় বৈচিত্র্যও ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় হাজার বছর আগেই দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউরোপীয়রা কৃষিকাজে দক্ষতা অর্জন করে। কিছু জায়গায় শিকারি-সংগ্রাহকরাও অন্যদের কাছ থেকে ধার করা কৌশল অবলম্বন করে কৃষকে পরিণত হয়। এসব ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। এর উত্তর খুঁজলেই জানা যাবে কিছু সমাজের কেন 'সব' রয়েছে, বিপরীতে কিছু সমাজ কেন এত পিছিয়ে। সেই ইয়ালির প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে।

প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আগে জানতে হবে কৃষিকাজের গোড়ার দিককার কিছু তথ্য। কখন কৃষিকাজ, পশুপালনের শুরু। এসব প্রশ্নের জুতসই উত্তর পাওয়া যাবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে, যেখানে নানাভাবে সংরক্ষিত হয়েছে গৃহপালিত পশু বা আবাদ করা শস্যের নমুনা। বিভিন্ন প্রজাতির পশু ও শস্যের আদি রূপও জানা সম্ভব এসব নিদর্শন থেকে। এখনকার গবাদিপশু, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, মটরদানার আদি রূপে ভিন্নতা ছিল। বর্তমানে কিছু প্রজাতির গৃহপালিত ছাগলের শিং তলোয়ারের মতো দেখতে, অথচ অতীতে বেশির ভাগেরই শিং ছিল স্ক্রুর মতো পেঁচানো। প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রগুলোয় রক্ষিত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে হাজার বছরের পুরনো কৌশল সম্পর্কেও জানতে পারি আমরা। তথ্য পাওয়া যায় সে সময়ের ভূপ্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কেও। শুরুর দিকে কৃষকরা পশুপালনের পাশাপাশি বন্য পশু শিকারেও নামত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আদি সভ্যতার নিদর্শন ও বন্য পশুর দেহাবশেষ দেখে।

ফসল উত্পাদন পৃথিবীর সব জায়গায় একসঙ্গে শুরু হয়নি। শুরুর দিকে উত্পাদন হতো অল্প কিছু শস্য। মোটামুটি পাঁচটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আলাদাভাবে কৃষিকাজ শুরু হয়। এগুলো হলো দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, চীন, মেসো আমেরিকা, মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেজ। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল ‘ফার্টাইল ক্রিসেন্ট’ বা উর্বর অর্ধচন্দ্র নামেও পরিচিত। মেক্সিকো, বেলিজ, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও কোস্টারিকার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত মেসো আমেরিকা।

এছাড়া আরো চারটি অঞ্চলে গোড়া থেকেই কৃষিকাজ শুরু হয়। এর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকার সাহেল জোন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পশ্চিম আফ্রিকা, ইথিওপিয়া ও নিউ গিনি। তবে আগের পাঁচটি অঞ্চলের সঙ্গে এগুলোর তুলনা চলে না।

অবশ্য সব অঞ্চলের মধ্যে সবার আগে কৃষিকাজ শুরু হয় পশ্চিম এশিয়ায়। প্রায় সাড়ে আট হাজার বছর আগে। পশুপালন শুরু আরো প্রায় ৫০০ বছর পর। প্রায় একই সময় কৃষকসমাজের উদ্ভব ঘটে চীনে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু আরো দুই হাজার বছর পর।

সব অঞ্চলেই স্বতন্ত্রভাবে পশু পালন করা হয়। চাষ করা শস্যের মধ্যেও ছিল অভূতপূর্ব কিছু প্রজাতি। পর্যায়ক্রমে অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা পশুর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। আমদানি করা প্রজাতির কিছু কিছু পরিচিতি পায় ‘ফাউন্ডার’ হিসেবে। এগুলো আমদানিকারক সমাজের চাষাবাদের ভিত্তি গড়ে দেয়ায় এমন নাম পায়। বেশির ভাগ অঞ্চলে ‘ভিত্তি প্যাকেজ’ জোগান দেয় দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া। সেখান থেকে আসা ভিত্তি প্যাকেজের ওপর নির্ভর করে সাড়ে তিন থেকে ছয় হাজার বছর আগে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের কৃষিকাজ আরো আধুনিকতা পায়। এশিয়া থেকেই ইউরোপে যায় পপি কিংবা যবের মতো শস্য। পরবর্তীতে তা স্থানীয় শস্য হিসেবেই চাষাবাদ হয়।

একইভাবে সাত হাজার বছর আগে এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে সিন্ধু উপত্যকায় যায় গম, বার্লি ও অন্যান্য শস্য। ‘ফার্টাইল ক্রিসেন্ট’ থেকে ইরানের মধ্য দিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বিকাশ হয় গরুজাতীয় গবাদিপশু ও তিলের মতো শস্যের। ছয় হাজার বছর আগে আফ্রিকার মিসরে চাষ শুরু হয় সিকামোর নামে একশ্রেণীর গাছ ও চুফা নামে স্থানীয় এক ধরনের সবজির।

অন্য এলাকা থেকে আমদানি করা উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রাধান্যেই কি স্থানীয়রা হারিয়ে গেছে? নাকি স্থানীয় শিকারি-সংগ্রাহকরা নিজেদের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে? এমন প্রশ্ন ঘুরেফিরেই আসে। অবশ্য দুই ধরনের উদাহরণই দেখা যায়। মিসরের শিকারি-সংগ্রাহকরা আমদানি করা শস্য চাষাবাদে নিজেদের মানিয়ে নেয়। কিছু অঞ্চলে চাষাবাদ শুরু হয় সম্পূর্ণ বিদেশীদের হাতে। আধুনিক যুগে ইউরোপীয়দের আগ্রাসনে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, আর্জেন্টিনার প্যাম্পাস, অস্ট্রেলিয়া ও সাইবেরিয়ায় কৃষিকাজ শুরু হয়। ইউরোপীয় কৃষকরা দখলকৃত

ভূমিতে নিজেদের সঙ্গে আনা শস্য চাষ ও পশুপালনেই আগ্রহী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপে এসে ইউরোপীয়রা খোই নামে আদিবাসী শিকারি-সংগ্রাহকদের সন্ধান পায়। খোইদের মধ্যে কিছু অংশ ছিল কেবলই পশুপালক। তারা শুধুই স্থানীয় পশুপালন করত, শস্য চাষাবাদ নয়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিদেশী শস্যের চাষাবাদ শুরু হয়। ধারাবাহিকতায় স্থানীয় মানুষের জায়গাও দখল করে নেয় বিদেশীরা।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই এমন নজির স্থাপন হয়। লিখিত রেকর্ড না থাকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে ওইসব পরিবর্তন জানা যায় প্রত্নতাত্ত্বিক ও সভ্যতার অন্য নিদর্শন থেকে।

মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে জানা যায় তাদের দৈহিক গঠন থেকে। শিকারি-সংগ্রাহকদের সঙ্গে শস্য উত্‌পাদনকারীদের কঙ্কালে পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। খাদ্য উত্‌পাদনকারীরা মৃিশল্পের মতো কিছু কাজে দক্ষতার পরিচয় দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য ইউরোপে কৃষির পাশাপাশি মৃিশল্প বিকাশ লাভ করে। এতে পুরনো গ্রিক ও জার্মান জীবনধারায় নতুন ধারার জন্ম নেয়। একইভাবে নতুন করে সামাজিক বিকাশ ঘটে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও নিরক্ষীয় আফ্রিকা অঞ্চলে। পূর্বসূরি শিকারি-সংগ্রাহকের তুলনায় উত্তরসূরি কৃষকদের মধ্যে দৈহিক যে পার্থক্য ছিল, তা ইউরোপের তুলনায় বেশি দৃশ্যমান ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও নিরক্ষীয় আফ্রিকায়। এতে বোঝা যাচ্ছে, একশ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণী দ্বারা প্রতিস্থাপনের ঘটনা অন্য অঞ্চলের তুলনায় ইউরোপে কম ছিল।

‘হ্যাভস অ্যান্ড হ্যাভ নটসের’ ইতিহাসের সারসংক্ষেপে বলা যায়, পৃথিবীর সব জায়গায় একই সঙ্গে ফসল উত্‌পাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। অনেক শিকারি-সংগ্রাহকও পর্যায়ক্রমে কৃষকে পরিণত হন। এভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিকাজের সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় পরবর্তী অর্জন। বারুদ, ইস্পাত ও মহামারীর নিয়ন্ত্রণও থাকে তাদের হাতেই।

# খাদ্যোৎপাদন থেকে বিনিময় প্রথা

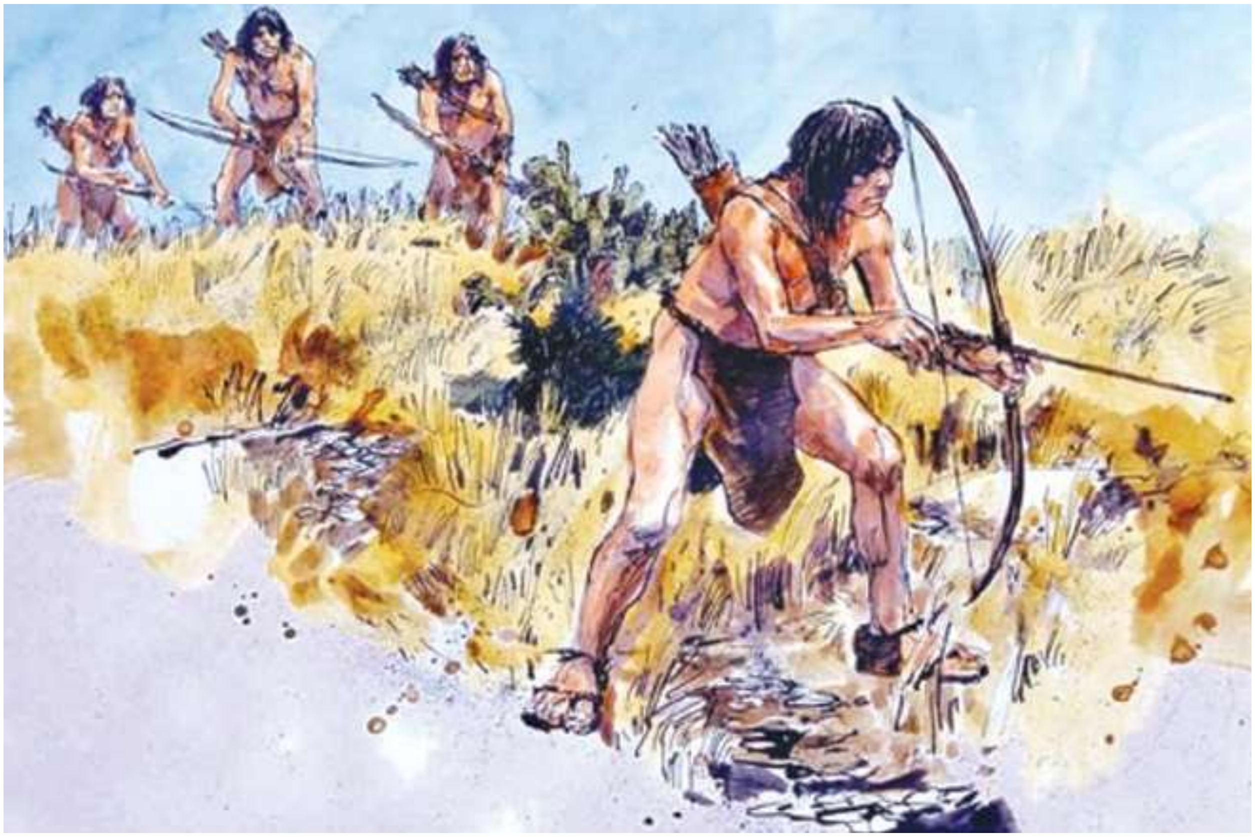

শুরুতে পৃথিবীর সব সমাজের মানুষই ছিল শিকারি-সংগ্রাহক। কেউই বিষয়টি চিন্তা করেনি কেন? এর পেছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ ছিল। কৃষিকাজ শুরু হয় খ্রিস্টজন্মের সাড়ে আট হাজার বছর আগে। পশ্চিম এশিয়ার ফার্টাইল ক্রিসেন্টের মানুষ কেন এত দেরিতে ফসল উৎপাদনে নামে? এখনকার যুগে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা কারো কারো হাসির খোরাক জোগাতে পারে।

আসলে শিকারি-সংগ্রাহকদের কিছু সীমাবদ্ধতাই তাদের কৃষিকাজের দিকে নিয়ে যায়। কেমন ছিল শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনধারা? এর উত্তর পাওয়া যায় থমাস হবসের উক্তিতে— 'নোংরা, বন্য ও সংক্ষিপ্ত।' আদিযুগের মানুষ ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমী। খাবারের খোঁজেই দিন পার করে দিত। কখনো কখনো অনাহারেই দিন কাটত। সাধ-আহ্লাদের বালাই ছিল না। খুবই অল্প বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করত তারা।

এখনকার উন্নত বিশ্বের মানুষ খাদ্যোৎপাদন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কৃষি-বাণিজ্যের সুফল হিসেবে তারা এ কাজ অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেয়। নানা সুযোগ-সুবিধা উপভোগের মধ্য দিয়ে দীর্ঘায়ু লাভের আশা করে। অথচ আগের দিনের কৃষককে কষ্টকর জীবন পার করতে হতো। 'টাইম-বাজেট' সমীক্ষায় বোঝা যায়, শিকারি-সংগ্রাহকের তুলনায় কৃষকদের বেশি সময় কাজ করতে হতো। প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণা বলে, প্রাথমিক যুগের বেশির ভাগ কৃষকই অপুষ্টির শিকার ও স্বল্পায়ু ছিলেন। প্রায়ই রোগে ভুগতেন। কৃষকরা শিকারি-সংগ্রাহকদের হটিয়ে দেন বটে, তবে আয়ু পান তাদের চেয়েও কম। ওই সময়কার কৃষকরা যদি এত কিছু বুঝতেন, তার পরও কি তারা এ কাজে নামতেন?

তখনকার কৃষকদের অবস্থা দেখে অনেক শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ পূর্বপুরুষের ধারা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকে প্রয়োজনীয় পণ্য কৃষকদের সঙ্গে বিনিময় করতে থাকে। যেমন উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার শিকারি-সংগ্রাহকরা তোরেস স্ট্রেইট দ্বীপপুঞ্জের কৃষকদের সঙ্গে কয়েক হাজার বছর ধরে পণ্য বিনিময় প্রথা চালু রেখেছিল। দ্বীপপুঞ্জটির অবস্থান অস্ট্রেলিয়া ও নিউ গিনির মাঝামাঝি অঞ্চলে। আমেরিকার আদিবাসী শিকারি-সংগ্রাহকরা পণ্য বিনিময় করত কলোরাডো নদী উপত্যকার আদিবাসী কৃষকদের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিশ নদীর পশ্চিম পাড়ের পশুপালকরা একই নদীর পূর্ব পাড়ের বান্টু কৃষকদের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করত। এভাবে বিপুল শিকারি-সংগ্রাহক বছরের পর বছর কৃষিকাজ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু কেন?

পর্যায়ক্রমে অবশ্য সব সমাজকেই কৃষিনির্ভর হয়ে উঠতে হয়। এক্ষেত্রে কিছু সমাজ অনেক বেশি সময় নিতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর জার্মানির উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীরা। লিনিয়ারব্যান্ডকেরামিক সংস্কৃতির লোকজন (ইউরোপের প্রথম কৃষক সমাজ) দেশের মূল ভূখণ্ডে কৃষিকাজ চালু করারও ১ হাজার ৩০০ বছর পর উপকূলের লোকজন তা শুরু করে। তাদের এত সময় লেগেছিল কেন?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আগে কিছু ভুল ধারণা দূর করতে হবে। আসলে খাদ্যোৎপাদনের বিষয়টি ‘আবিষ্কার’ কিংবা ‘উদ্ভাবন’ কোনোটিই হয়নি। এমনকি শিকার-সংগ্রহ ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে সচেতনভাবে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনি আদি মানুষেরা। দুই শ্রেণীর মধ্যে এক কথায় পার্থক্য করারও সুযোগ নেই। এ দুয়ের মাঝামাঝি শ্রেণীতেও অনেকে ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার অনেক শিকারি-সংগ্রাহক নির্দিষ্ট এক জায়গায়ই বসবাস করত। ফিলিস্তিন, পেরুর উপকূলীয় অঞ্চল ও জাপানের শিকারি-সংগ্রাহকরা প্রথমে নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসে অভ্যস্ত হয়। পরে চাষাবাদ শুরু করে। শিকারি-সংগ্রাহক থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসের প্রবণতা শুরু মূলত ১৫ হাজার বছর আগে। আবার কৃষিকাজে অভ্যস্ত, কিন্তু শিকারি-সংগ্রাহকের ভূমিকা নেয়, এমন সমাজেরও দেখা মেলে। এখনকার সময়ে নিউ গিনিতে কিছু যাযাবর সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। তারা কিছুদিন শিকারি-সংগ্রাহক আর কিছুদিন খাদ্যোৎপাদকের ভূমিকা নেয়। তারা জঙ্গল সাফ করে কলা ও পেঁপে গাছের চারা রোপণ করত। এগুলো বেড়ে ফসল ওঠা পর্যন্ত থাকত শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে। কয়েক মাস পর পর নিজেদের রোপণ করা ফসলের খোঁজ নিত। ফসল আশানুরূপ হতে দেখলে কিছুদিন পর পর তারা আগাছা সাফ করত। কিছু কিছু শিকারি-সংগ্রাহক উর্বর, ফসল ফলানোর উপযুক্ত ভূখণ্ডের যত্ন নিত। যেমন নিউ গিনির লোকজন নিজেরা চাষাবাদ না করলেও সাগু ও প্যান্ডানুসের (পামজাতীয় গাছ) যত্ন করত। ফলদায়ী এ গাছের আশপাশে অন্য উদ্ভিদ বা আগাছা জন্মাতে দেখলে তা উপড়ে ফেলত। বয়স্ক সাগু গাছের ডাল ফেলে নতুন চারা গজানোরও ব্যবস্থা করত। আদিবাসী অস্ট্রেলীয়রা কখনই কৃষকে পরিণত হয়নি। তারাও আগাছা-জঙ্গল পুড়িয়ে সে জায়গায় মিষ্টি আলুসহ অন্য শিকড়জাতীয় সবজি আবাদের ব্যবস্থা করত। মিষ্টি আলুর কন্দের কিছু অংশ রেখে যখন বাকিটা জমিতে ফেলে রাখত, তা থেকেই নতুন চারা গজাত। কাজেই শিকারি-সংগ্রাহক ও কৃষক সমাজের মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা নির্ধারণ করা জটিল।

তাছাড়া খাদ্যোৎপাদনের পর্যায়গুলো ব্যাকরণ মেনে গড়ে ওঠেনি। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাদ্যোৎপাদনে যেতে অনেক সমাজের হাজার বছরের বেশি প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকে মানুষ যুগপত্ভাবে বন থেকে খাবার সংগ্রহের পাশাপাশি নিজেরাও চাষাবাদ করত। একপর্যায়ে বনের ওপর নির্ভরশীলতা কমতে থাকে।

ক্ষুধা নিবারণ করাই ছিল মানুষের খাবার গ্রহণের প্রধান কারণ। পর্যায়ক্রমে এর পুষ্টিগুণ ও স্বাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কদর বাড়ে প্রোটিন, চর্বি ও লবণযুক্ত খাবারের। ফলের চাহিদা ছিল আদি যুগ থেকেই। এক কথায় যা কিছু জিহ্বায় স্বাদ জোগাত, তা-ই ছিল মানুষের খাবার। দিনে দিনে মানুষ উপোস থাকার ঝুঁকি কমিয়ে আনে। সেখান থেকেই তৈরি হয় বাগান গড়ে তোলার চর্চা। প্রায় ১১ হাজার বছর আগে বাগান তৈরির চর্চা শুরু। এগুলো ছিল এক ধরনের সংরক্ষণশালার মতো। বুনো উৎস নিঃশেষ হয়ে গেলেও তারা বাগানে উৎপাদিত সবজি-ফল দিয়ে চাহিদা মেটাতে পারত।

শিকারি-সংগ্রাহকদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ‘ইজ্জত’। ব্যাখ্যা দেয়া যাক। তারা প্রতিদিনই জিরাফ শিকারে যেত। কিন্তু মাসে একদিন হয়তো সফল হতো। এতেই বিরাট শিকারির খেতাব জুটত। নিজস্ব ফসল ফলানোর চেয়ে শিকারকেই তারা সম্মানজনক কাজ বলে গণ্য করত। এ সংস্কৃতির কারণেও অনেক শিকারি-সংগ্রাহক চাষাবাদে ঝোঁকেনি। কৃষিনির্ভর সমাজের মানুষ শিকারি-সংগ্রাহকদের ‘আদিম’, ‘সেকেলে’ বলে বিবেচনা করত। আর শিকারিরা কৃষকদের ‘অশিক্ষিত’ ভাবত। এক সমাজের প্রতি অন্যের উষ্মা প্রাকৃতিক। ১৯ শতকেও যুক্তরাষ্ট্রের গো-পালক, মেষপালক ও কৃষকরা একে অন্যকে অবজ্ঞা করত।

বোঝাই যায়, কোনো মহাদেশের কৃষকরাই খুব জেনে-বুঝে আবাদযোগ্য শস্য খুঁজে বের করে নি। এমনকি অন্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময়েরও সুযোগ ছিল না বললেই চলে। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে অনুসরণের প্রবণতা বাড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কৃষকরা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দানাদার ও ডালজাতীয় শস্য আবাদের কৌশল ধার করেন। শিখে নেন পশুপালনেরও কিছু তত্ব। এটা ছয় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা। এর অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপের অন্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও দুই ধরনের শস্য উৎপাদন ও পশুপালন বিদ্যা আয়ত্ত করে। পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইউরোপের সর্বত্রই দেখা যায় এর প্রচলন। খাদ্য জোগাড়ে শিকারি-সংগ্রাহকদের উৎপাদনশীলতা কম থাকায় কৃষির আওতা বাড়তে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপেও কৃষিনির্ভরতা বাড়ে। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল, স্পেন ও ইতালিতে প্রথমে পৌঁছে মেষপালন ও পরে শস্য চাষ। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডেও ধীরে ধীরে পুরোদমে চাষাবাদ শুরু হয়। জাপান ও আশপাশ অঞ্চলে স্থানীয় উদ্ভিদ এবং সামুদ্রিক উৎসের খাবারের আধিক্য থাকায় সেখানে চাষাবাদ শুরু হয় বহু স্তরে।

# শিকারি-সংগ্রাহক বনাম কৃষিনির্ভর সমাজ

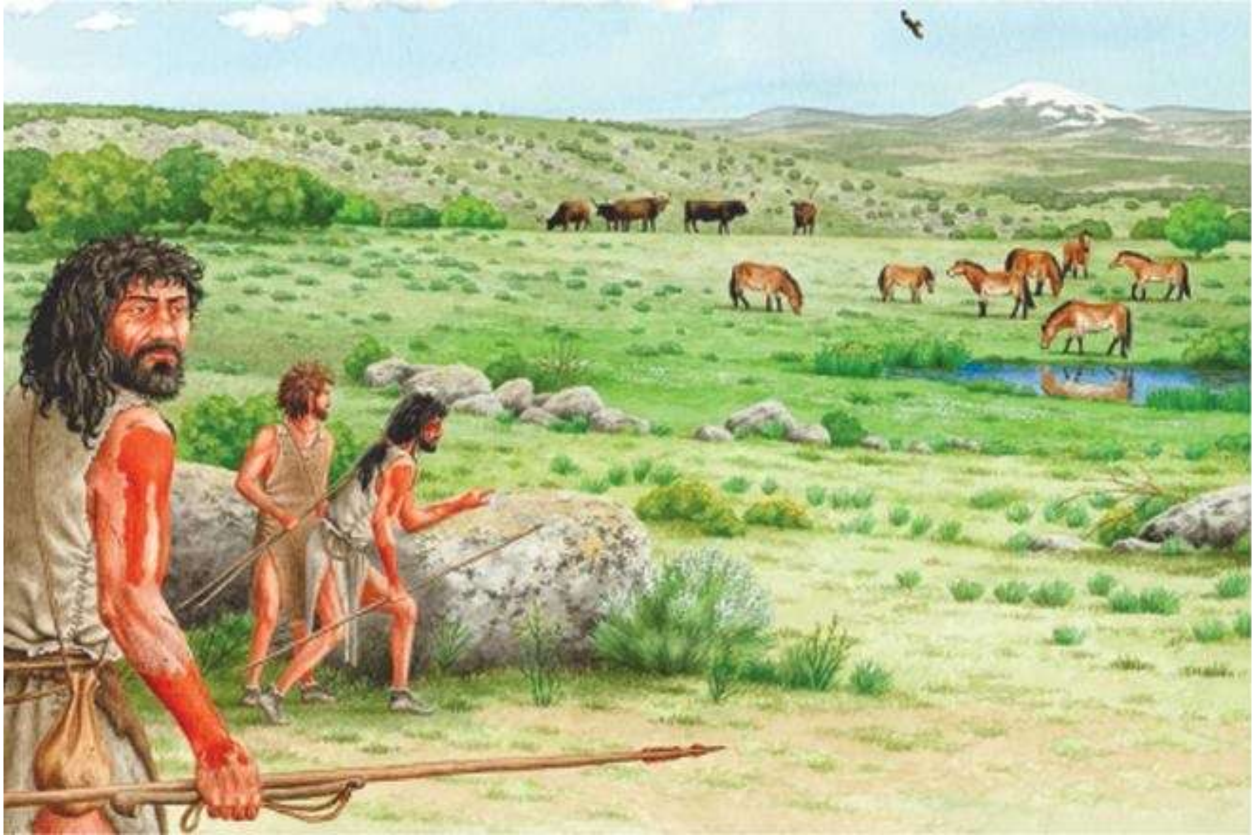

শিকারি-সংগ্রাহক ও কৃষক— প্রাচীন এ দুই পেশার মধ্যে সমাজ বিকাশের ধারায় যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার তুলনামূলক ব্যাখ্যা জানাটা আমাদের জন্য বেশ জরুরি। শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনধারার কিছু বিষয় যেমন কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষ অনুসরণ করেছিল, তেমনি এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছিল। মোদ্দাকথা, এ দুই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও অর্জন বিনিময় হতো নিয়মিতই। আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের রেড ইন্ডিয়ানরা স্থানীয় শস্য আবাদ করত। তবে মেক্সিকোর রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল। মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানরা শস্য, স্কোয়াশ ও শিমজাতীয় সবজির ত্রিমুখী চাষাবাদ শেখে। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা ধীরে ধীরে মেক্সিকানদের ধারা অনুসরণ করে। সেখানে বিভিন্ন শস্য পৌঁছে ২০০ খ্রিস্টাব্দে। এরও ১০০ বা ২০০ বছর পর পৌঁছে অন্যান্য শস্য।

ফসল উৎপাদনকারীরা শিকারি-সংগ্রাহকের ভূমিকায় ফিরে গেছে— এমন ঘটনাও দেখা গেছে। যেমন তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ সুইডেনের শিকারি-সংগ্রাহকরা এশিয়া থেকে আসা শস্যের চাষাবাদ শুরু করে। কিন্তু তার ৩০০ বছর পরই আবার তা ছেড়ে দিয়ে আগের মতো ভবঘুরে জীবন যাপনে ফিরে যায়। এর ৪০০ বছর পর আবার ফিরে আসে কৃষিকাজে।

জীবনধারায় দুটি পদ্ধতিই ছিল একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আবার একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী; সম্পূরকও। গত ১০ হাজার বছরে মানুষ যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন ছেড়ে ফসল উৎপাদনে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর পেছনে অবশ্যই কিছু কারণ ছিল; যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পেছনের নির্ধারক বিষয়গুলো একই রকম ছিল না। হাজার বছরের পুরনো দিনগুলোয় কার্যকারণ এমনভাবে পেঁচিয়ে ছিল, যার জট এখন খোলা মুশকিল। তার পরও কিছু নিয়ামক শনাক্ত করা যায়।

প্রথমত. বন্য উৎস থেকে সরবরাহ কমে যায়। ১৩ হাজার বছরে শিকারি-সংগ্রাহকদের পরিশ্রমের তুলনায় উৎপাদন হ্রাস পায়। সহজে শিকারযোগ্য পশুর প্রাচুর্যও কমে যায়। প্লাইস্টোসিন যুগের শেষে আমেরিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকে। এদের সংখ্যা কমায় ভূমিকা রাখে দুটি বিষয়। একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যটি দক্ষ শিকারির সংখ্যা বৃদ্ধি। তবে নানা কারণেই বিভিন্ন জন্তু হারিয়ে যেতে থাকে। এতে কদর বাড়তে থাকে অগুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর। পলিনেশিয়ায় প্রথম দিকের বসতি স্থাপনকারীরা আসার পর মোয়া নামে উড়তে অক্ষম একশ্রেণীর পাখি বিলুপ্ত হয়ে যায়। নির্বংশ হয় নিউজিল্যান্ডের সিল। পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলোয় সামুদ্রিক ও ভূভাগের পাখির সংখ্যাও কমে যায় আশঙ্কাজনক হারে। এতেই খাদ্যোৎপাদনের দিকে ঝোঁকেন অধিবাসীরা। ৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্টার দ্বীপে পৌঁছে পলিনেশীয়রা। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল মুরগি। কিন্তু তখন কোনোভাবেই জনপ্রিয় ছিল না গৃহপালিত এ পাখি। অন্যান্য বুনো পাখি ও ডলফিনজাতীয় প্রাণী পরপয়েজের বিলুপ্তির পরই গুরুত্ব বাড়ে মুরগির। একইভাবে ফার্টাইল ক্রিসেন্টে বন্য গজলা হরিণ কমে আসার পর সেখানকার শিকারি-সংগ্রাহকরা পশু পালনের চর্চায় বাধ্য হয়।

দ্বিতীয়ত. অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার ফলে শিকারি-সংগ্রাহকদের সুযোগ কমে যায়। ফলে যেসব বন্য উদ্ভিদ চাষাবাদের সুযোগ ছিল, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। প্লাইস্টোসিন যুগ শেষে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশাল এলাকায় চাষযোগ্য জমি তৈরি হয়। সেখানে বাড়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুযোগ। পরে ফার্টাইল ক্রিসেন্টে বার্লি ও গম উৎপাদন শুরু হয়।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলেও শিকারি-সংগ্রাহকদের তুলনায় কৃষিনির্ভর সমাজের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। নানা ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে কৃষিকাজ সহজ হতে থাকে। কিন্তু শিকার ধরার জন্য ব্যতিক্রম কোনো উদ্ভাবন ছিল না। তার ওপর সংগৃহীত শিকার বা অন্য খাদ্য প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণের মতো পদ্ধতি জানা ছিল না তখনকার মানুষের।

প্রয়োজনের তাগিদেই শস্য সংরক্ষণের কৌশল আবিষ্কার করে কৃষকরা। ফার্টাইল ক্রিসেন্টে ১১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে উদ্ভাবন হতে থাকে নানা কৌশল। এর মধ্যে ছিল পাথর ঘষে বানানো কাস্তে, যার হাতল ছিল কাঠ বা হাড়ের তৈরি। পাকা ফসল ঘরে তুলতে কাস্তে চালাত তারা। শস্য বহন করার জন্য ঝুড়িও বানিয়ে নেয়। খোসা ছাড়ানোর জন্য উদ্ভাবন হয় হামানদিস্তা। গুঁড়ো করার জন্য শিল-পাটা। শস্য সিদ্ধ করে অঙ্কুরোদ্গম ঠেকানোর বিষয়েও দক্ষতা অর্জন করে। সেগুলো সংগ্রহ করা হতো মাটির গর্তে, প্রয়োজনে তা পানিনিরোধী করতে দেয়ালে পলেস্তারাও দেয়া হতো। ১১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফার্টাইল বাসিন্দাদের আস্তানায় এসবের নিদর্শন দেখা যেত। ওই সরঞ্জামগুলো মূলত বন্য শস্য প্রক্রিয়াকরণের জন্যই তৈরি হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে নিয়মিত শস্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সেগুলো ব্যবহার হয়।

চতুর্থত. একদিকে জনঘনত্ব বৃদ্ধি ও অন্যদিকে খাদ্যোৎপাদনের বাড়তি চাহিদা। জনসংখ্যা বাড়ার কারণে খাদ্যোৎপাদনের গুরুত্বও বাড়তে থাকে। বিভিন্ন সময় প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। খাদ্যোৎপাদন বাড়ায় জনসংখ্যা বেড়েছে, নাকি জনসংখ্যা বাড়ায় খাদ্যোৎপাদন? এ কার্যকারণ ‘ডিম আগে না মুরগি আগে?’ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পৌনঃপুনিক।

এক একর জমি থেকে শিকারি-সংগ্রাহকরা যে পরিমাণ খাদ্য জোগাড় করতে পারত, তার চেয়ে কয়েক গুণ পাওয়া যেত একজন কৃষকের জমিতে। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই কৃষিকাজে ঝুঁকতে বাধ্য হয় আদি মানুষ। ভৌগোলিক সীমারেখাও শিকারি-সংগ্রাহকের তুলনায় কৃষক সমাজকে এগিয়ে রাখে। কৃষক সমাজে জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তারা একেক অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান জোরালো করার পর নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। প্রয়োজনে নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে শিকারি-

সংগ্রাহকদের হটিয়ে দিত। এ কারণে শিকারি-সংগ্রাহকদের সামনে কেবল দুটো পথই খোলা ছিল। হয় কৃষকদের কাছে নতিস্বীকার করা কিংবা নিজেদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনা। এভাবে কৃষকরা শিকারি-সংগ্রাহকদের স্থলাভিষিক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চল, ইউরোপে আটলান্টিকের উপকূলীয় অঞ্চলেই এমন ঘটনা ঘটে। ইন্দোনেশিয়া, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে এ স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি ঘটে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। অনেকটা পরে এ ধারা দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল ও অস্ট্রেলিয়ায়।

২০ শতকেও গুটি কয়েক মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক টিকে ছিল আর্কটিক কিংবা মরুভূমির মতো রুক্ষ এলাকায়। মূলত খাদ্যোৎপাদনের অনুপযুক্ত এলাকা হওয়ায় তাদের ডেরায় অন্যরা হানা দেয়নি। এ শিকারি-সংগ্রাহকরাও সভ্যতার মোহে, মিশনারিদের চাপে কিংবা জীবাণুর শিকার হয়ে মানবসভ্যতার মূল স্রোতে মিশে যেতে থাকে।

# উদ্ভিদের ওপর কর্তৃত্বের চেষ্টা

দীর্ঘদিন ধরে ক্ষেতখামারে উৎপাদিত একই ধরনের ফলমূল খেয়ে তৈরি হয় একঘেয়েমি। এমন পরিস্থিতিতে বুনো ফলমূল ভিন্ন স্বাদ জোগাতে পারে। কারো কারো হয়তো জানা আছে, স্ট্রবেরি ও ব্লুবেরির মতো বুনো ফল যেমন সুস্বাদু, তেমনি নিরাপদ। এগুলো বুনো হলেও ক্ষেতে চাষ করা ফলের মতোই নিরাপদ। যারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের কেউ কেউ নতুন নতুন খাবার আবিষ্কারে পটু। বিষাক্ত কিংবা খাওয়ার উপযোগী ফলের মধ্যে তারা সহজেই পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। যেমন মাশরুমের অনেক প্রজাতি জীবনহানিকর। কাজেই অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা সতর্কভাবে মাশরুম খেয়ে থাকে। উপযুক্ত প্রজাতির মাশরুম যেমন নিরাপদ, এর বিপরীত হলে তা বয়ে আনতে পারে ভয়াবহ বিপদ।

এমনই আরেক ধরনের ফল বাদাম। প্রচণ্ড বাদামপ্রেমীও কোনোভাবেই বুনো বাদাম গলাধঃকরণে সাহসী হবে না। আধডজন প্রজাতির বাদামের মধ্যে সায়ানাইড থাকে। বনে-জঙ্গলে এমনই অসংখ্য বিষাক্ত ফলমূল রয়েছে। যদিও বেশির ভাগ শস্যই কোনো না কোনোভাবে বন থেকে উৎপত্তি। বুনো উদ্ভিদের এভাবে মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন।

কিছু প্রজাতির বুনো উদ্ভিদ ও এর ফলমূল সাংঘাতিক বিষাক্ত। তার পরও এসবের নানা প্রজাতি বিবর্তনের ধারায় আমাদের খাবারের উৎস পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে কাঠবাদামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাদামটির পূর্বজ ছিল যেমন বিস্বাদ, তেমনই বিষাক্ত। আবার এখনকার ভুট্টার দিকে তাকালে এর পূর্বসূরির চেহারা কল্পনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। গুহামানবরা কীভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদ চাষাবাদের ধারণা পেল? কীভাবেইবা তারা এতে সফল হলো?

এসব উদ্ভিদ 'চাষাবাদ' বলতে বোঝায় আদি মানুষের হাতে নিজের মতো করে গুছিয়ে নেয়াকে। মানুষের ভোগের উপযোগী হতে এসব গাছগাছালি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আদিম মানুষ সে অর্থে সচেতন ছিল না। গাছপালার পরিবর্তনের বিষয়টি এখনো ঘটছে। এতে অবদান রাখছেন বিজ্ঞানীরা। অনেক জ্ঞান, প্রজ্ঞা খাটিয়ে পেশাদারিত্বের সঙ্গে উদ্ভিদের জীবনচক্রে পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। মূল উদ্ভিদের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রজাতি। এগুলোকে যত বেশি সম্ভব মানুষের উপযোগী করা হচ্ছে। জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন জাত। বিজ্ঞান এতটাই সূক্ষ্ম ফল লাভের চেষ্টা করছে যে, কেবল একটি ফল নিয়ে গবেষণার জন্যই গড়ে উঠছে ইনস্টিটিউট। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাভিস ক্যাম্পাসে আপেল নিয়ে গবেষণার জন্য তৈরি হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব পমোলজি এবং অঙ্গুর ও মদ নিয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব ভিটিকালচার অ্যান্ড এনোলজি।

মানুষের গাছপালা ‘পোষ’ মানানোর প্রচেষ্টা শুরু অন্তত ১০ হাজার বছর আগে। আদি কৃষকরা অবশ্যই তাদের কাঙ্খিত পণ্য পেতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান খাটায়নি। তারা তাদের মতো করেই এগিয়েছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল উৎপাদিত শস্য বা ফল যেন খেতে সুস্বাদু হয়। আদিকালের কৃষকদের কাছে উত্সাহ পাওয়ার মতো কোনো নমুনা গাছ ছিল না। তারা কেবল সুস্বাদু ফল পাওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করত। যেভাবেই হোক, হাজার বছর আগের কৃষকরা যেভাবে বিষাক্ত বুনো ফল খাওয়ার উপযোগী করেছে, তা বিস্ময়কর। তাদের হাতের জাদুতে তেতো ফল মিঠায়, পুঁচকে ফল প্রমাণ আকার পায়।

মানুষের হাতের নাগালে আনতে বিভিন্ন ফসলের নানা মেয়াদ প্রয়োজন পড়ে। যেমন— মোটরদানা-জাতীয় শস্য ৮ হাজার ও জলপাই ৪ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে পুরোপুরি মানুষের হাতের নাগালে আসে। স্ট্রবেরি চাষে মানুষের নিয়ন্ত্রণ আসে মধ্যযুগে। আর পেকান (আমেরিকায় এক ধরনের বাদাম) নাগালে আসে ১৮৪৬ সালে। ওক গাছের ফল এখনো বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে খাওয়ার উপযোগী করা যায়নি। কেন কিছু কিছু গাছ খুব সহজেই বশ মানে? কিছু কিছু এখনো বড় বড় বিজ্ঞানীরও প্রভুত্ব মানছে না?

বিষয়টি ব্যাখ্যায় গাছের দৃষ্টি মূল্যায়ন করা যাক। পৃথিবীতে হাজারো প্রজাতির প্রাণী আছে। তার মধ্যে মানুষও পড়ে। মানুষের মতো অন্য প্রাণীও গাছের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করে। অন্য প্রাণীর মতো বৃক্ষরাজিকেও বংশবিস্তার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের সামনে বাধা রয়েছে। জীবজন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করতে পারে। কিন্তু গাছ কী করবে? তাকে তো এক জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে অন্যের সহায়তা নেয়। কখনো বাতাসের, কখনো প্রবহমান নদীর, কখনো পাখির কিংবা অন্য প্রাণীর। সবাই ভাবে, গাছের ফল মানুষের জন্য পেকে ওঠে।

গাছের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি কিন্তু তেমন নয়। ফলের এ আকর্ষণীয় রূপের পেছনে রয়েছে গাছের বংশবিস্তারের চেষ্টা। ফল পাকার অর্থ হলো, এর ভেতরের বীজ নতুন চারার জন্ম দিতে প্রস্তুত। ফল পাকলে যে সুন্দর রঙ ধারণ করে ও মিষ্টি গন্ধ তৈরি হয়, তা মূলত বিজ্ঞাপন! ফল কোনোমতে পাকলেই তা থেকে নতুন চারা গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। ফলবীজ পাখির পেটে কিংবা বাতাসের তোড়ে হাজারো মাইল দূরে ছড়িয়ে পড়ে। অবাক করা তথ্য— মানুষের পেটে গেলেও অনেক ফলবীজ হজম হয় না। মলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েও তা নতুন চারা উৎপাদনে সক্ষম।

কিছু বুনো উদ্ভিদের ফল পশুর অন্ত্রের মধ্য দিয়ে না গেলে অঙ্কুরোদ্গমে সক্ষম হয় না। যেমন আফ্রিকার তরমুজ। এর বীজ হায়েনার মতো একশ্রেণীর জন্তুর পেট থেকে ঘুরে না এলে চারা উৎপাদন করতে পারে না।

ভবঘুরে মানুষ যেমন অন্যের গাড়িতে সওয়ার হয়ে বিনা ভাড়ায় গন্তব্যে পৌঁছে, তেমনি কিছু উদ্ভিদও অন্য জায়গায় নিজের বীজ ছড়িয়ে দেয়। এর উদাহরণ হতে পারে বুনো স্ট্রবেরি। কাঁচা স্ট্রবেরির বীজ থেকে নতুন চারা গজানো সম্ভব নয়। অপরিপক্ব ফলটি সবুজ, টক ও শক্ত। যখন এর বীজ পরিপক্ব হয়, স্ট্রবেরি লাল, মিষ্টি ও মোলায়েম হয়ে ওঠে। মনোহরী রঙটি তখন বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করে। সরালি-জাতীয় অসংখ্য পাখি আকৃষ্ট হয় এর প্রতি। তারা ঠোঁটের আগায় স্ট্রবেরি নিয়ে দূর-দূরান্তে উড়ে যায়। ঠোঁট থেকেই কিংবা পাখির অন্ত্রের ভেতর দিয়ে স্ট্রবেরির বীজ নতুন কোনো জায়গায় ঠিকানা গাড়ে। প্রাকৃতিক এ চক্র ঠিক রাখতে আসলে স্ট্রবেরি কিংবা পাখির কেউই সচেতনভাবে ভূমিকা রাখে না। এটাই প্রকৃতি। এভাবে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ নানা উপায়ে বংশ রক্ষা করে। এভাবে ওক গাছ কাঠবিড়ালির সহায়তায়, আম গাছ বাদুর ও হোগলা গাছ পিঁপড়ার মাধ্যমে বংশ রক্ষা করে। এসবে মানুষের কোনো হাত নেই।

আদি মানুষ অনেকটা না বুঝেই নানা শ্রেণীর উদ্ভিদকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছ। নানা স্তর পেরিয়ে বুনো ফলমূল মানুষের খাওয়ার উপযোগী হয়। বুনো ফলমূলের অধিকাংশই মানুষের কর্তৃত্বে উৎপাদিত ফলের তুলনায় ছোট ও কটু স্বাদযুক্ত। প্রথম দিকে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই আমাদের পূর্বপুরুষরা ফল উৎপাদন করত। কিন্তু এখন বাণিজ্যিকভাবে ফল উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে থাকে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। এখনকার সুপারমার্কেটে যে বেরি পাওয়া যায়, তা বুনো বেরির তুলনায় প্রকাণ্ড। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে বেরির আকৃতিতে পার্থক্যের মাত্রা বেড়েছে। শিকারি–সংগ্রাহকরা হাজার বছর ধরে যে মটরদানা সংগ্রহ করত, চাষাবাদের আওতায় আসার পর বপু অন্তত ১০ গুণ বেড়ে যায়। এখন সুপারমার্কেটে যে আপেল পাওয়া যায়, তার গড়পড়তা ব্যাস তিন ইঞ্চি। অথচ বুনো আপেলের ক্ষেত্রে তা কমবেশি এক ইঞ্চি।

# সব সমাজের অবদানে কৃষির বিকাশ

বুনো ফল আহারযোগ্য হয়ে ওঠার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ কাঠবাদাম। অধিকাংশ প্রজাতির কাঠবাদামে ছিল অ্যামিগডালিন নামের কটু রাসায়নিক; যার তুলনা চলে বিষাক্ত সায়ানাইড গ্যাসের সঙ্গে। বুনো বাদামের কটু স্বাদ চেখেই যে কেউ বুঝতে পারবে এতে ঝামেলা আছে। এ প্রজাতির বাদাম খেয়ে অতীতে অনেকেরই প্রাণ গেছে। মানুষ একপর্যায়ে আবিষ্কার করে, কাঠবাদামের কিছু প্রজাতি খাওয়ার উপযুক্ত। একইভাবে পাখি ও অন্যান্য পশুও তা বুঝতে শেখে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর মানুষ খাওয়ার উপযোগী বাদামের চাষাবাদ শুরু করে। এ গাছের রূপান্তরের ধারায় ছিল নানা ঘটনা।

আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের গ্রিসের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে কাঠাবাদামের উপস্থিতি জানা গেছে। তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তা ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে দেখা যায়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে প্রয়াত ফারাও তুতেনখামেনের কফিনেও কাঠবাদাম পাওয়া গেছে। তার সমাধিতে এটি দেয়া হয়েছিল পরবর্তী জীবনে তা যেন তুতেনখামেনকে পুষ্টি জোগায়। এ ফলের মতোই শিম, তরমুজ, আলু, বাঁধাকপি ও বেগুনের পূর্বসূরিরা বিষাক্ত ছিল।

বুনো ফলমূলের বংশবিস্তারে মানুষ ও পশুর বর্জ্যের ভূমিকা রয়েছে। মলত্যাগ কিংবা ঘর থেকে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্টও এর অন্তর্ভুক্ত। এখনো বুনো অনেক ফলের বংশবিস্তার ঘটে এ প্রক্রিয়ায়। মানুষ বন-জঙ্গল থেকে যেসব উদ্ভিদ বা ফলের গাছ লোকালয়ে নিয়ে আসে, বাড়িতে পৌঁছার আগেই তা পচে যায়। এসব পচা ফল থেকেও নতুন গাছের বীজ পাওয়া যায়। স্ট্রবেরির মতো কিছু ফলের বীজ মানুষ থুতুর সঙ্গে ফেলে। আবার কিছু ফলের বীজ মলের সঙ্গেও বেরিয়ে যায়। এ বর্জ্যই অতীতে বিশেষ ধরনের ‘ল্যাবের’ ভূমিকা নিয়েছিল।

আকার ও স্বাদের ভিত্তিতে শিকারি-সংগ্রাহকরা বুনো উদ্ভিদ থেকে খাবার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিত। অন্য বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল বীজের তুলনায় বেশি স্থূল অংশের পরিমাণ, তৈলাক্ততা ও লম্বা আঁশ (লং ফাইবার)। হাজার বছর আগে কলার চাষ শুরু করার মূল কারণ ছিল এতে স্থূল অংশের বেশি উপস্থিতি। তার ওপর অধিকাংশ প্রজাতির কলায় বীজ থাকে না। হালের বিজ্ঞানীরা কলার মতো বিচিমুক্ত কমলা, আঙুর, তরমুজ উত্পাদনের চেষ্টা করে সফলও হয়েছেন।

ভূমধ্যসাগরের আশপাশে যেসব ফলদায়ী গাছের পরিচর্যা শুরু হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে জলপাই গাছ। তেলের জন্য চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে জলপাইয়ের চাষ হয়। মানুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত জলপাইয়ের আকার বড় ছিল না। তবে এর তেল ছিল বুনো জলপাইয়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। প্রাচীন কৃষকরা তেলের জন্যই সরিষা, তিল, তিসি, পোস্ত চাষ করত।

এখনকার গবেষকরা একই কাজ করছেন সূর্যমুখী, তুলা ও অন্য উদ্ভিদ নিয়ে। তুলা গাছ থেকে তেল পাওয়ার উপায় নিয়ে এখন গবেষণা হচ্ছে। এর আগে কেবল বস্ত্র তৈরির কাঁচামাল পাওয়ার জন্যই এর চাষ হতো। নতুন ও পুরনো— দুই পৃথিবীর মানুষই স্বতন্ত্রভাবে হাজার বছর ধরে তুলার চাষ করে আসছে। একইভাবে চাষ হয়ে আসছে ফ্লেক্স শন ও এ-জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদের।

প্রচলিত ধারণা রয়েছে, প্রাচীন মানুষ কেবল খাবারের প্রয়োজনেই বিভিন্ন উদ্ভিদ চাষ করত। বাস্তবে তা নয়। তিসির চাষ শুরু হয় সাত হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর ব্যবহার ছিল লিনেন কাপড় প্রক্রিয়ার কাজে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত এর ছিল একতরফা কদর। শিল্প বিপ্লবের পর সিনথেটিক ও সুতি কাপড়ের আগমনে এর কদর কমে।

সব উদ্ভিদ একই সময়ে চাষাবাদ শুরু হয়নি। কিছু কিছুর চাষ যেমন ১০ হাজার বছর আগে শুরু হয়, তেমনি কিছু উদ্ভিদের চাষাবাদ শুরু হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ফার্টাইল ক্রিসেন্টেই সবার আগে গম ও বার্লির আবাদ শুরু। আমাদের পূর্বপুরুষের হাত ধরে ওই সময় নাগাদ খাওয়ার উপযোগী শস্যে পরিণত হয় এগুলো। বপন করার পর অল্প যত্নেই এগুলো পরিপক্ব হতো। ফসল ঘরে তোলা যেত তিন মাসের মধ্যেই। শুরুর দিককার কৃষকরা এ শস্যের ওপর নির্ভর করে অন্য শিকারি-সংগ্রাহকদের তুলনায় বাড়তি সুবিধা পেতেন। কেননা শস্যগুলো সংরক্ষণ করা যেত। আরো কয়েক হাজার বছর পর স্ট্রবেরি ও লেটুস পাতার চাষ মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসে। সুস্বাদু এ ফল ও সবজি সংরক্ষণের কোনো উপায় ছিল না। ওই সময়ে মানুষের বশে আসা অধিকাংশ উদ্ভিদের স্বপরাগায়ণ ঘটত। মানুষের খাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এগুলোর বড় ধরনের জিনগত পরিবর্তন প্রয়োজন হয়নি।

চাষাবাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ফল ও বাদাম-জাতীয় গাছের রক্ষণাবেক্ষণ। এর শুরু চার হাজার বছর আগে। ফলদায়ী গাছের মধ্যে ছিল জলপাই, ডুমুর, ডালিম ও আঙুর। দানাদার শস্য ও শিম-জাতীয় উদ্ভিদের তুলনায় ফলদায়ী গাছের কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্রথম ফলন জোগান দিতে অন্তত তিন বছর সময় নিত। পুরো উদ্যমে ফল দেয়ার উপযোগী হতে প্রায় এক দশক লেগে যেত। কাজেই যে কৃষিনির্ভর সমাজ গ্রামে বাস করত, তারাই এর সুফল পেত। যা-ই হোক, ফল ও বাদাম-জাতীয় গাছ লালন-পালন করার ক্ষেত্রে বড় ঝক্কি পোহাতে হতো না। ফলদায়ী এসব গাছের অংশ, কিংবা ফলের বীজ থেকেই চারা তৈরি করার সুবিধা ছিল। বিশেষ করে কাটিংয়ের সুবিধা ভালো জাতের ফল গাছ সংরক্ষণে কৃষকদের অনেকটাই সাহায্য করে।

জীবনধারা আরেকটু উন্নত হওয়ার পর চাষাবাদের জন্য তুলনামূলক কঠিন ফলদায়ী গাছগুলোও নিয়ন্ত্রণে আসে। আপেল, নাশপাতি, আলুবোখারা ও চেরি গাছের যত্ন নেয়া খানিকটা কঠিন কাজ। এগুলোর বীজ কিংবা কাটিং থেকেও চারা পাওয়া যেত না। এর চারা তৈরি করা হতো গ্রাফটিং বা জোড় কলমের বদান্যতায়, যার উদ্ভাবন হয় চীনে। জটিল এ কাজের কাঙ্ক্ষিত ফলও ছিল অনিশ্চিত। এসব গাছের পরাগায়ণ নিয়ে ছিল বিস্তর সমস্যা। অন্য শ্রেণীর গাছের সহায়তা নিয়ে এর পরাগায়ণ করানো হতো। শুরুর দিকে কৃষকরা তাই এ শ্রেণীর গাছে আগ্রহী ছিল না। এ কারণে আপেল, নাশপাতি, আলুবোখারা ও চেরি চাষ শুরু হয় অনেক দেরিতে।

কৃষকের অজান্তে অনেকটা অল্প পরিশ্রমেও কিছু ফসল উত্পাদন হতো। এগুলো শুরুর দিকে বুনো আগাছা নামে পরিচিত ছিল। অন্য শস্যের ক্ষেতে জন্মাত রাই, যব, শালগম, মুলা, বিট, লিক (পেঁয়াজ-জাতীয়) ও লেটুস। ফার্টাইল ক্রিসেন্টে এভাবেই চাষাবাদ শুরু হয়।

পৃথিবীর অন্য অঞ্চলগুলোতেও কৃষিকাজের বিস্তার ঘটে। ফার্টাইল ক্রিসেন্টের গম ও বার্লির মতো প্রজাতির দানাদার শস্য উত্পাদন হয় অন্য অঞ্চলগুলোয়। একইভাবে ডাল-জাতীয় শস্যও মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসে। দানাদার শস্য প্রচুর শর্করায়

পূর্ণ। এগুলোর হেক্টরপ্রতি উত্পাদন কয়েক টন। এর সুবাদে বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করে, তার অর্ধেকই জোগায় দানাদার শস্য (সিরিয়াল)। আধুনিক পৃথিবীর শীর্ষ ১২ শস্যের পাঁচটিই সিরিয়াল। এ শ্রেণীর শস্যের কিছুতে প্রোটিনের মাত্রা কম। তবে তা পূরণ হয় ডাল-জাতীয় শস্যের কল্যাণে। এভাবে দানাদার ও ডাল-জাতীয় শস্যের সমন্বয়ে মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যতালিকা তৈরি হয়।

মানুষের খাদ্যতালিকায় একাধিক শস্যের সমন্বয়ে ভারসাম্য রক্ষা হয়। ফার্টাইল ক্রিসেন্টে তা গম, বার্লি ও মটর-ডালের সমন্বয়ে, মেসো আমেরিকায় কয়েক শ্রেণীর বিনের সঙ্গে ভুট্টা এবং চীনে সয়াবিন ও অন্যান্য বিনের সঙ্গে ধান ও বাজরার (মিলেট) সমন্বয়ে।

নিচের টেবিল থেকে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

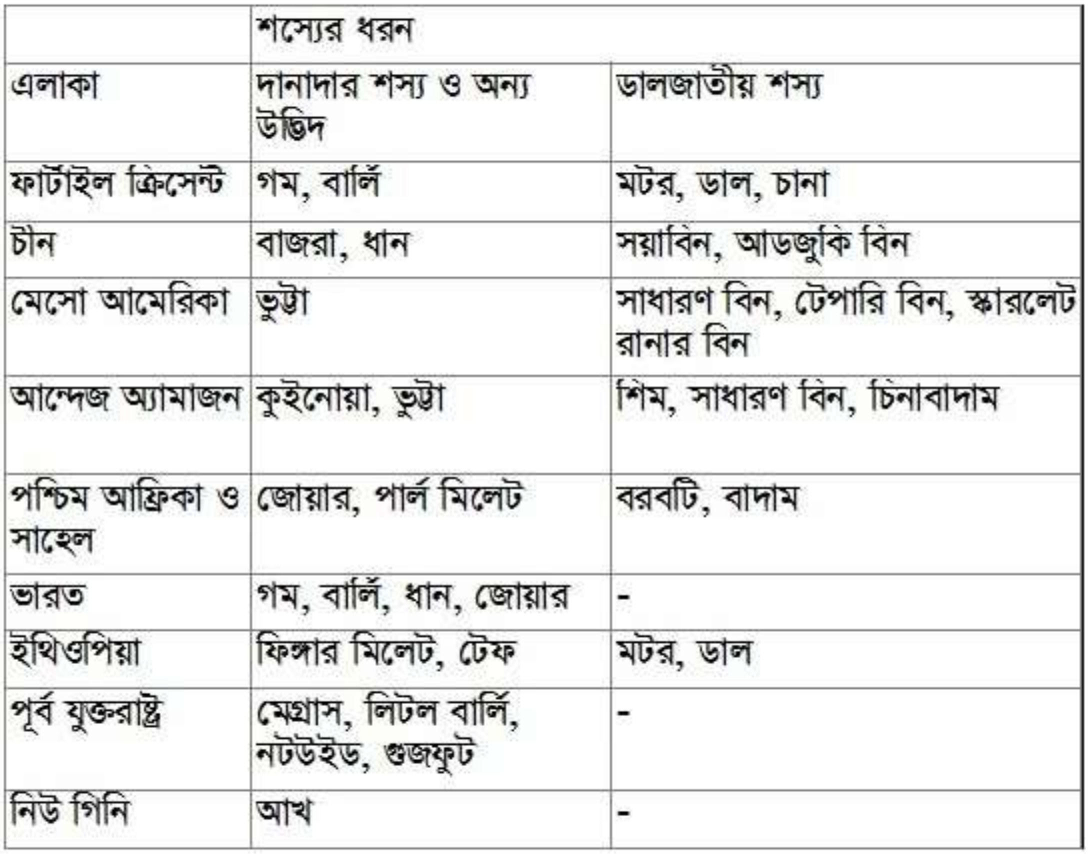

| | শস্যের ধরন | |
|---|---|---|
| এলাকা | দানাদার শস্য ও অন্য উদ্ভিদ | ডালজাতীয় শস্য |
| ফার্টাইল ক্রিসেন্ট | গম, বার্লি | মটর, ডাল, চানা |
| চীন | বাজরা, ধান | সয়াবিন, আডজুকি বিন |
| মেসো আমেরিকা | ভুট্টা | সাধারণ বিন, টেপারি বিন, স্কারলেট রানার বিন |
| আন্দেজ অ্যামাজন | কুইনোয়া, ভুট্টা | শিম, সাধারণ বিন, চিনাবাদাম |
| পশ্চিম আফ্রিকা ও সাহেল | জোয়ার, পার্ল মিলেট | বরবটি, বাদাম |
| ভারত | গম, বার্লি, ধান, জোয়ার | - |
| ইথিওপিয়া | ফিঙ্গার মিলেট, টেফ | মটর, ডাল |
| পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র | মেগ্রাস, লিটল বার্লি, নটউইড, গুজফুট | - |
| নিউ গিনি | আখ | - |

# ফার্টাইল ক্রিসেন্টের কর্তৃত্ব

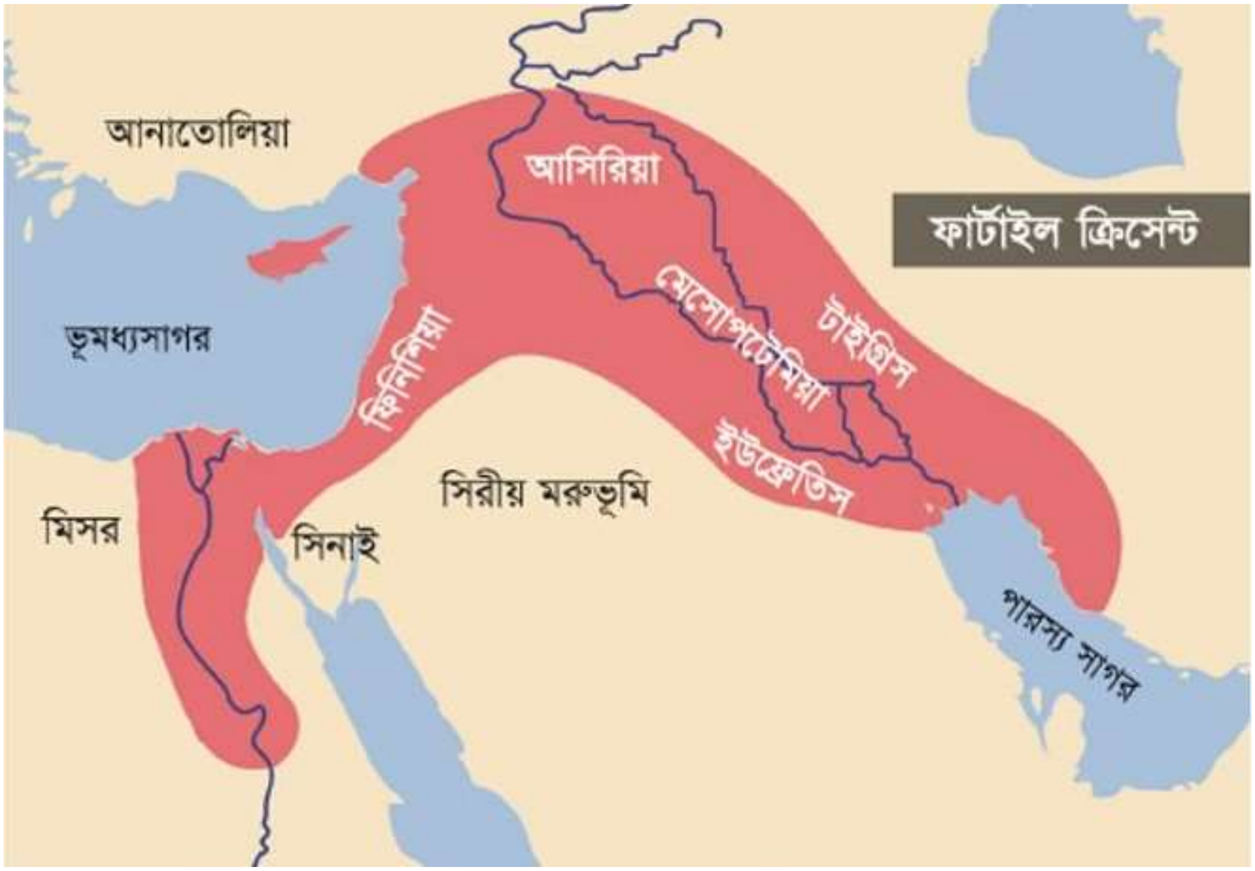

ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণে কিছু অঞ্চলের মানুষ চাষাবাদের মাধ্যমে বুনো উদ্ভিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। এর সুবাদে ওই অঞ্চলগুলোর মানুষের উত্তরসূরিদের জীবনধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। এমনকি পরবর্তী ইতিহাসেও তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান অক্ষুণ্ণ থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অঞ্চলভেদে কৃষিকাজ কেন আগে-পরে শুরু হয়েছিল? আবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন কিছু অঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু হতে কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে যায়?

এ প্রশ্নের একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতা। আরেকটি হচ্ছে স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত শস্য না পাওয়া। বিশ্বের বেশির ভাগ ক্রান্তীয় অঞ্চলে চাষাবাদের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তার পরও কিছু কিছু জায়গার মানুষ ফসল উৎপাদনে অনেক বছর পিছিয়ে পড়েছিল। সেসব জায়গায় ব্যর্থতার জন্য দায়ী বিষয়ের অন্যতম মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীতে প্রায় দুই লাখ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। তবে এর সিংহভাগই মানুষকে খাবার জোগাতে পারে না। এর মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার মানুষের খাওয়ার উপযোগী। এখন হাতেগোনা কয়েক ডজন শস্যই পৃথিবীবাসীর খাদ্যের উৎস। এর মধ্যে রয়েছে গম, ভুট্টা, চাল, বার্লি, সয়াবিন, গোল আলু, কাসাভা, মিষ্টি আলু। মিষ্টি স্বাদ জোগানের দায়িত্ব আখ ও সুগার বিটের। ফলের মধ্যে সর্বব্যাপী হিসেবে উল্লেখযোগ্য কলা। বর্তমানে দানাদার শস্যই আধুনিক পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষকে ক্যালরি জোগায়।

পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষ কেন সমানভাবে ফসল উৎপাদনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, তা ব্যাখ্যা করাটা সহজ নয়। সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে আফ্রিকার সাহেল জোনে বাজরার চাষ হতো। অথচ মহাদেশটির দক্ষিণের দেশগুলোয় এটি বুনো উদ্ভিদ হিসেবেই পরিচিত ছিল। দুই হাজার বছর আগে উত্তরাঞ্চল থেকে এগুলো এনে সাহেল জোনে চাষাবাদ শুরু করে বান্টু কৃষকরা। দক্ষিণের লোকজন কেন এর চাষাবাদ শুরু করেনি?

একইভাবে প্রশ্ন ওঠে তিসি চাষে ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার কৃষকদের ব্যর্থতা নিয়ে। আইনকর্ন প্রজাতির গম চাষ শুরু হয়নি বলকান অঞ্চলেও। অথচ এগুলোই ছিল ফার্টাইল ক্রিসেন্টে প্রথম চাষাবাদ শুরু হওয়া আটটি শস্যের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শস্য।

একইভাবে ফার্টাইল ক্রিসেন্টে মানুষের বশে আসার অনেক পর কিছু ফলবৃক্ষ ইউরোপে জনপ্রিয়তা পায়। এর মধ্যে রয়েছে জলপাই, আঙুর ও ডুমুর। ইতালির পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এগুলোর চাষাবাদ শুরু হয়। খেজুর চাষ ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আফ্রিকা ও আরব অঞ্চল পর্যন্ত। এ চার শ্রেণীর বৃক্ষই বুনো অবস্থা থেকে সহজে চাষাবাদ উপযোগী করে তোলার সুযোগ ছিল। তার পরও এগুলো কেন ফার্টাইল ক্রিসেন্টের চাষীদের হাত ধরেই অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে?

নানা কারণেই ফার্টাইল ক্রিসেন্ট মানবসভ্যতার বিবর্তনে অগ্রগামী ছিল। মানচিত্রে দেখতে অর্ধচন্দ্রাকৃতির মতো হওয়ায় অঞ্চলটির এ নাম। আফ্রিকার মিসর, সিনাই, লেভান্ত, অ্যাসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ফিনিশীয়, পারস্য উপসাগরের উত্তর উপকূলীয় অঞ্চল নিয়েই ফার্টাইল ক্রিসেন্ট। সভ্যতার অনেক কিছুরই গোড়াপত্তন ফার্টাইল ক্রিসেন্ট থেকে। নগরায়ণ, লেখনী, সাম্রাজ্যবাদের ধারণা এখান থেকেই পরিচিতি পায়। জনঘনত্ব, খাদ্য সংরক্ষণের সুবিধা অন্য অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব তৈরির সুযোগ করে দেয় এখানকার বাসিন্দাদের। চাষাবাদ ও পশুপালনই এখানকার সভ্যতার প্রথম ধাপ। কাজেই আধুনিক পৃথিবী সম্পর্কে জানতে হলে ফার্টাইল ক্রিসেন্টের গোড়ার দিকের তথ্য উদ্ঘাটন করতে হবে। বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট নিয়েই সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে।

ফার্টাইল ক্রিসেন্টে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিদ্যমান। এখানে সহনীয় আর্দ্র শীত ও দীর্ঘ শুষ্ক গ্রীষ্ম বজায় থাকে। এখানকার উদ্ভিদগুলো দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে টিকে থাকতে অভ্যস্ত। বর্ষা মৌসুমে সেগুলো আবারো আকারে বাড়তে থাকে। ফার্টাইল ক্রিসেন্টের উদ্ভিদ, বিশেষ করে দানাদার ও ডালজাতীয় শস্য চাষাবাদে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু সুবিধা পাওয়া যেত। এখানে ছিল একবর্ষী ফসলের আধিক্য। এ শ্রেণীর উদ্ভিদ এক বছরের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে। এ সময়ের মধ্যেই তারা ফুল, ফল ও বীজ দিয়ে মাটিতে মিশে যেত।

অধিকাংশ একবর্ষজীবী উদ্ভিদের ফসল মানুষের খাদ্যতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এগুলো দানাদার বা ডালজাতীয় খাদ্যশস্য। পৃথিবীর শীর্ষ ১২টি ফসলের ছয়টি এ-জাতীয়।

ফার্টাইল ক্রিসেন্টের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল, সেখানকার শস্যের সর্বব্যাপিতা ও উৎপাদনশীলতা। এসব শস্যের গুরুত্ব শিকারি-সংগ্রাহকরাও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য অঞ্চলটির শিকারি-সংগ্রাহকরা অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষকসমাজে পরিণত হয়। ফার্টাইল ক্রিসেন্টের মতো চীন ও আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলেও শস্যের প্রাচুর্য ছিল। আরেকটি সুবিধা ছিল এর ‘উভলিঙ্গ সেলফার’ শস্য। এর অর্থ হচ্ছেন উদ্ভিদগুলো নিজ থেকেই পরাগায়ণ করতে পারত। প্রয়োজনে অন্যের সহায়তায়ও পরাগায়ণ ঘটত।

এমন নানা কারণে ফার্টাইল ক্রিসেন্টের কৃষকরা বিশেষ সুবিধা পেতেন। এসব কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর বুনো উদ্ভিদ মানুষের নাগালে আসে। সেখানকার ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

একই ধরনের জলবায়ু ছিল আরো চার অঞ্চলে। এগুলো হলো— ক্যালিফোর্নিয়া, চিলি, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ সেখানকার কৃষকরা ফার্টাইল ক্রিসেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেননি। সেখানে কোনো শস্যের ভিত্তি প্যাকেজও উদ্ভূত হয়নি।

এ উদ্ভিদসম্পদের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট ভূগোলবিদ মার্ক ব্লান্ডার। তার মতে, পৃথিবীতে হাজারের বেশি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ রয়েছে। ব্লান্ডার এর মধ্যে ৫৬টি বড় বীজবিশিষ্ট বলে শ্রেণীকৃত করেছেন। এগুলোর বীজ একই জাতীয় অন্য উদ্ভিদের তুলনায় অন্তত ১০ গুণ বড়। ৫৬টি সুবিধাজনক উদ্ভিদের প্রায় সবই ছিল ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায়। ফার্টাইল ক্রিসেন্টেই ছিল প্রায় অর্ধেক। বিশেষ করে বার্লি ও গম (এমার প্রজাতি) বীজের আকারভেদে তৃতীয় ও ১৩তম।

ফার্টাইল ক্রিসেন্টে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ভূমিরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেখানকার সর্বনিম্ন স্থান ডেড সি (মৃত সাগর) ও সর্বোচ্চ স্থান তেহরানের নিকটবর্তী ১৮ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। পাহাড়গুলোর কোলঘেঁষা নিম্নভূমি, প্রবহমান নদী, ফ্লাড প্লেইন সেচভিত্তিক কৃষিকাজের সুবিধা দেয়। ভূমির উচ্চতার তারতম্য নানা প্রজাতির শস্য উৎপাদনের কাজও সহজ করে দেয়। শিকারি-সংগ্রাহকরাও অনায়াসে পাহাড়ঘেঁষা জমি থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করত। শুরুতে কৃষকরা পুরোমাত্রায় বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। চাষ পদ্ধতি উন্নত হওয়ার পর তারা উপত্যকার আর্দ্র মাটিতে শস্য আবাদের কৌশল রপ্ত করেন। এতে সেচ সুবিধার বদৌলতে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীলতা কমে।

ফার্টাইল ক্রিসেন্টে অল্প জায়গাজুড়ে বিপুল জীববৈচিত্র্যও বিশেষ সুবিধা এনে দেয়। শস্যের পাশাপাশি সেখানে বড় বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী মানুষের পোষ মানে। ছাগল, ভেড়া, শূকর ও গরুর মতো উপকারী পশু সেখানে গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। বিশ্বে সবচেয়ে পরিচিত উপকারী গৃহপালিত মোট প্রাণীর সংখ্যা যেখানে পাঁচ; ফার্টাইল ক্রিসেন্টেই প্রথম পোষ মানে এর চারটি।

ফার্টাইল ক্রিসেন্টের অধিবাসীরা অন্য অঞ্চলের তুলনায় শিকারি-সংগ্রাহকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে অল্পই পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় হাতেগোনা অল্প কিছু বড় নদ-নদী রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তারও সীমিত। ফলে জলজ উৎসের খাবার কম জোটে সেখানকার অধিবাসীদের। এ কারণে প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে বুনো জন্তুর কদর বাড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গজলা হরিণ। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের শিকার হওয়ার একপর্যায়ে এর সংখ্যা দ্রুতই কমে যায়।

এভাবে কৃষক সমাজের খাদ্য আয়োজন সমৃদ্ধ হয়। শিকারি-সংগ্রাহকদের তুলনায় তারা আরো একধাপ এগিয়ে যায়। অন্য অঞ্চলের তুলনায় ফার্টাইল ক্রিসেন্টের শিকারি-সংগ্রাহকরা অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষকে পরিণত হয়। ৯ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মানুষ পুরোপুরি বন্য উৎসের খাবারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এর তিন হাজার বছরের মধ্যেই কিছু কিছু সমাজ পুরোপুরি উৎপাদিত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

# পোষ মানেনি সব পশু

আদি মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রথম দিকে বন্য উৎসর প্রতিই পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। সভ্যতার বিবর্তনে পশুর পেছনে না ছুটে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু পশুর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা যায়নি। পোষ মানা ও গৃহপালিত পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গরু, ঘোড়া, ছাগল, মোষ প্রভৃতি।

কিছু পশু কোনোভাবেই পোষ মানাতে পারেনি মানুষ। কারণ একেক পশু একেকটি কারণে আলাদা। আর যেসব পশু পোষ মেনেছে, তাদের সবার বৈশিষ্ট্যই প্রায় একই রকম। স্তন্যপায়ীর মধ্যে জেব্রা ও পেকারি কখনই মানুষের পোষ মানেনি।

বিভিন্ন সময় পোষ মানা জন্তুগুলো মানুষকে মাংস, দুধ, চামড়ার জোগান দিয়ে এসেছে। অধিকাংশ পশুর বিষ্ঠা সার হিসেবে দারুণ কার্যকর প্রমাণিত। এছাড়া যানবাহন ও লাঙল টানার কাজেও এসেছে।

পশুর মতো অনেক পাখিও পোষ মেনেছে মানুষের। এদের লালন-পালন করা হয় মূলত মাংস, ডিম ও পালকের জন্য। চীনে মুরগি, ইউরেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের হাঁস, মেসো আমেরিকায় টার্কি, আফ্রিকায় তিতির, দক্ষিণ আমেরিকায় মাসকোভি হাঁস পালন করা হয়।

ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় শিকারকাজে সহায়তা ও প্রহরার জন্য নেকড়ে পালন করা হতো। কিছু সমাজে অবশ্য খাবারের প্রয়োজনেও নেকড়ের কদর ছিল। স্তন্যপায়ী রডেন্টের (তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী) মধ্যে ইউরোপে খরগোশ, আন্দেজে গিনিপিগ ও পশ্চিম আফ্রিকায় জায়ান্ট র্যাট পালন করা হতো। ক্যারিবীয় অঞ্চলে (সম্ভবত) হুটিয়া নামে একশ্রেণীর রডেন্ট পালন করত মানুষ।

১৯ ও ২০ শতকে মানুষ যে ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী লালন শুরু করে তার মধ্যে রয়েছে শিয়াল, মিংক (বেজিজাতীয়), চিনচিলা ও হ্যামস্টার (ইঁদুর শ্রেণীর)। পশম ও পোষা প্রাণী হিসেবে এগুলো লালন-পালন করত। কিছু পতঙ্গও মানুষ বশে আনে। এর মধ্যে রেশমের জন্য চীনে মথ (গুটি পোকা) ও মধুর জন্য ইউরেশিয়ায় মৌমাছির চাষ হতো।

তুলনামূলক ছোট বপুর পশুগুলো খাবার, পোশাক ও উষ্ণতা জোগাত। কিন্তু এদের কেউই লাঙল কিংবা গাড়ি টানত না। শুরুর দিকে কোনো প্রাণীর পিঠে মানুষ সওয়ার হতো না। যুদ্ধক্ষেত্রেও ছিল না এদের ব্যবহার। বড় স্তন্যপায়ীর তুলনায় এদের উপযোগ যে কম ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীর অল্প কিছুই মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে, যার বেশির ভাগই তৃণভোজী। উল্লেখ করা প্রয়োজন, মানুষের কর্তৃত্ব কেবল মাটির ওপরের পশুর বেলায়ই প্রযোজ্য। পানির নিচের স্তন্যপায়ীর ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় অনেক পরে।

'বড়' বলতে ১০০ পাউন্ডের বেশি ওজনের বোঝানো হচ্ছে, এমন মাত্র ১৪টি প্রাণী ২০ শতকের আগে মানুষের নিয়ন্ত্রণের আসে। প্রাচীন ১৪টির মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়টি সীমিত কয়েকটি অঞ্চলের গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। বিপরীত দিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পৃথিবীর সবখানেই দেখা যায়। এগুলো হলো গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর ও ঘোড়া।

এ তালিকা দেখে কারো কারো মনে হতে পারে, হাতির কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন। আসলে হাতিকে পোষ মানানো হয়েছে। বিশাল বপুর প্রাণীটি মূলত গৃহপালিত নয়। বুনো পশু আটকের পর তা পোষ মানানো হয়, এরা বন্দি অবস্থায় বংশ বিস্তার করে না।

গৃহপালিত পশু বলতে বোঝায়, যেসব পশু মানুষের নিয়ন্ত্রণে আটকা থেকে বংশ বিস্তার করে। এসব পশুর খাদ্যাভ্যাস, বংশবিস্তার মানুষের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের নানা কাজ সহজ করতে বুনো বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটা পরিবর্তিত হয় গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে। আদিরূপের সঙ্গে তুলনা করলে গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন চোখে পড়ে।

বর্তমান গরু, ভেড়া ও শূকর গৃহপালিত হিসেবে আদিরূপের চেয়ে ক্ষুদ্রকায় হয়েছে। বিপরীতে গিনিপিগের আকার বেড়েছে। বন্য পূর্বপুরুষের তুলনায় অনেক প্রাণীর মস্তিষ্কের আকার ছোট হয়ে গেছে। বুনো অবস্থায় শিকারির নাগাল এড়াতে প্রাণীরা যেভাবে মাথা খাটাত, বিবর্তনের ধারায় তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

প্রাচীন যুগের তৃণভোজী গৃহপালিত বড় স্তন্যপায়ী প্রধান পাঁচটি

১. ভেড়া: প্রাণীটির পূর্বপুরুষ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে বিচরণ করত। বর্তমানে বিশ্বের সব জায়গায়ই ভেড়া দেখতে পাওয়া যায়।

২. ছাগল: পশ্চিম এশিয়ার বেজোয়ার গোট থেকে এর উদ্ভব। বর্তমানে দুনিয়ার সবখানেই ছাগল পাওয়া যায়।

৩. গরু, ষাঁড়: গরুর পূর্বপুরুষ অরোকস নামের একটি প্রাণী, যা এখন বিলুপ্ত। উত্তর আফ্রিকা ও ইউরেশিয়া অঞ্চলে ছিল এর বিচরণ।

৪. শূকর: বন্য শূকরের উত্তরসূরিরা এখনো টিকে আছে। এ প্রাণীও উত্তর আফ্রিকার ও ইউরেশিয়া থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এটি মূলত সর্বভুক প্রাণী। তালিকার প্রাচীন এ ১৪ প্রাণীর অধিকাংশই তৃণভোজী।

৫. ঘোড়া: পরিশ্রমী এ প্রাণীর পূর্বপুরুষের বসবাস ছিল দক্ষিণ রাশিয়ায়। পুরনো দিনের ওই বুনো ঘোড়ার আরেকটি প্রজাতি এখনো মঙ্গোলিয়ায় টিকে আছে।

কম গুরুত্বপূর্ণ নয়টি

৬. আরবি উট (এক কুঁজ): এর পূর্বপুরুষ বিলুপ্ত। আরব ও এর আশপাশ অঞ্চলে বিচরণ করত। এখনো আরব ও উত্তর আফ্রিকায়ই এদের দেখা যায়। অল্প কিছু বুনো উট রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।

৭. ব্যাকট্রিয়ান উট (দুই কুঁজ): মধ্য এশিয়ার বুনো উট থেকে এর বিকাশ। এখনো একই অঞ্চলে দেখা যায় দুই কুঁজবিশিষ্ট ব্যাকট্রিয়ান উট।

৮. লামা ও অ্যালপ্যাকা: প্রায় উটের মতো দেখতে প্রাণী দুটি একই প্রজাতি থেকে উদ্ভূত। আন্দেজের গুয়ানাকো নামে একশ্রেণীর প্রাণী থেকে এর উৎপত্তি। আন্দেজ অঞ্চলেই প্রাণী দুটি বেশি দেখা যায়। অবশ্য উত্তর আমেরিকায় মালপত্র টানার কাজে খাটানোর উদ্দেশ্যেও এদের লালন-পালন করা হয়।

৯. গাধা: ভারবাহী পশুটির পূর্বপুরুষ ছিল উত্তর আফ্রিকা ও সংলগ্ন এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে। উত্তর আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ায় গৃহপালিত হিসেবে ব্যবহার হতো। অতিসম্প্রতি এটি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

১০. বল্গা হরিণ: উত্তর ইউরেশিয়ায় প্রাণীটির বেশি দেখা মেলে। এর পূর্বপুরুষও একই অঞ্চলে বিচরণ করত। বর্তমানে আলাস্কায়ও বল্গা হরিণ দেখা যায়।

১১. মোষ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাণী। এখনো গৃহপালিত পশু। ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও অন্য কয়েকটি অঞ্চলে এটি ছড়িয়ে পড়েছে।

১২ ইয়াক: হিমালয় ও তিব্বতের মালভূমিতে দেখা যায়। একই এলাকায় গৃহপালিত পশু হিসেবে টিকে আছে।

১৩. বালি ক্যাটল: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যানটেং (অরোকস-সদৃশ) থেকে এর উদ্ভব ও এখনো গৃহপালিত।

১৪. গয়াল: ভারত ও মিয়ানমারে পাওয়া যায় গরুসদৃশ প্রাণী।

# গৃহে পালনযোগ্য পশুর ছয় বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর সব অঞ্চলে সব প্রাণী গৃহপালিত হয়নি। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে আদি মানুষ গৃহপালনের জন্য পশু নির্বাচন করত। এক্ষেত্রে নির্ভর করা হতো পশুর উপযোগিতার ওপর। লোমের জন্য ভেড়া ও অ্যালপ্যাকা; দুধের জন্য গরু নির্বাচন করা হয়। পশু আয়ত্তে আনতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষ বিবেচনায় নিত, সেগুলোকে মূলত ছয়টি ভাগে ফেলা যায়—

খাদ্যতালিকা: গৃহপালিত হতে হলে যেকোনো পশুর খাদ্যতালিকা সহজ হতে হবে। অর্থাত্ যে পশুর খাবারের তালিকায় বৈচিত্র্য রয়েছে, তাকে পোষ মানানো সহজ। এতে বিকল্প সুযোগ থাকে। যেমন— কোয়ালা যে ধরনের খাবার খায়, তা দিয়ে প্রাণীটিকে গৃহপালিত হিসেবে লালন-পালন করা কঠিন। এজন্য খুব কম স্তন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণীকে পোষ মানানো সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে কুকুর ব্যতিক্রম। শুরুর দিকে শিকারে সহযোগী ও পাহারাদার হিসেবেই কুকুর পালা হতো। অ্যাজটেক মেক্সিকো, পলিনেশিয়া ও প্রাচীন চীনে মাংসের উত্স হিসেবেও কুকুরের কদর ছিল। এখনো কিছু সমাজে মাংসের চাহিদা মেটায় কুকুর। অ্যাজটেকদের কাছে স্তন্যপায়ী হিসেবে অন্য কোনো প্রাণী ছিল না। পলিনেশিয়া ও প্রাচীন চীনে কেবল কুকুর ও শূকর ছিল। কুকুরকে অবশ্য শুধু মাংসাশী বলা যায় না, বরং সর্বভুক। অ্যাজটেক ও পলিনেশিয়ায় মাংসের উত্স হিসেবে যে কুকুর পালা হতো, সেগুলোকে শুধুই সবজি ও উচ্ছিষ্ট খাওয়ানো হতো।

দৈহিক বৃদ্ধির হার: মানুষের কাজে আসতে হলে পশুকে দ্রুত বাড়তে হবে। প্রমাণ আকারে পৌঁছতে যেসব প্রাণী বেশি সময় নেয়, তাদের লালন-পালন করা কষ্টসাধ্য। এর পেছনে বিনিয়োগও করতে হয় অনেক বেশি। যেমন— তৃণভোজী হলেও হাতিশাবক পূর্ণবয়স্ক হতে প্রায় এক যুগ সময় নেয়। প্রাপ্তবয়স্ক হতে বেশি সময় নেয়া আরেক প্রাণী গরিলা। কেমন হতো, যদি গরিলা ও হাতির খামারিরা ১৫ বছর ধরে সুফলের অপেক্ষা করত? বর্তমানে এশিয়ার যেসব সমাজ হাতিকে কাজে লাগাতে চায়, তারা বন থেকে হাতি শিকার করে পোষ মানায়। শাবক অবস্থা থেকে লালন-পালনের ঝামেলায় যেতে চায় না।

সীমিত স্থানে টিকে থাকার যোগ্যতা: অনেক প্রাণী বদ্ধ, সীমাবদ্ধ স্থানে টিকে থাকতে পারে না। বৃদ্ধির জন্য এদের উন্মুক্ত জায়গা দরকার হয়। যেসব প্রাণী আটকা অবস্থায় টিকে থাকতে ও বংশবিস্তার করতে না পারে, সেগুলো গৃহপালনের উপযোগী নয়। সবচেয়ে দ্রুতগতির প্রাণী চিতাকে গৃহপালিত করার সহস্র চেষ্টা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। মিসরীয় ও আসিরীয় সভ্যতায় বিশেষ গুরুত্ব ছিল প্রাণীটির। শিকারের কাজে সহচর হিসেবে কুকুরের চেয়ে চিতার কদর বরাবরই বেশি ছিল। ভারতে কোনো এক মোগল সম্রাট হাজারের বেশি চিতা খাঁচায় আটকে রাখতেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই গৃহপালিত ছিল না। এর সবই বন থেকে ধরে আনতে হয়েছিল।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৬০ সালে বন্দি অবস্থায় প্রথমবারের মতো চিতা শাবকের জন্ম সম্ভব হয়। বনে-জঙ্গলে পুরুষ চিতা কয়েক দিন তাড়া করার পর মাদি চিতার সংস্পর্শে আসতে সমর্থ হয়। বংশবিস্তারে এ স্বাধীনতা গৃহপালিত চিতাকে দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বললেই চলে।

এ ধরনের আরেক উটজাতীয় প্রাণী আন্দেজের বুনো ভিকুনা। এর পশম যেমন কোমল, তেমনি হালকা। হাজার উদ্যোগের পরও গৃহপালিত ভিকুনা দেখার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেছে। ইনকারা বুনো ভিকুনাকে তাড়া করে খোঁয়াড়ে আটকে এর পশম সংগ্রহ করতেন। হালের ব্যবসায়ীরা ভিকুনার পশম জোগাড়ে ইনকাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেন। প্রয়োজন হলে ভিকুনা হত্যায়ও পিছপা হন না।

সহাবস্থান: অধিকাংশ বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী মানুষ হত্যা করতে সক্ষম। শূকর, ঘোড়া, উট কিংবা গরুর আঘাতে বিভিন্ন সময়ই মানুষের প্রাণ হারানোর ঘটনা জানা যায়। কিছু প্রজাতির প্রাণী লালন-পালনে ঝক্কি বেশি। খামারিরা পশু পালন করতে তো জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে না! যেমন অনেক আগে ধারণা করা হতো, জেব্রা গৃহপালিত হলে তা বেশ উপকারে আসবে। কিন্তু সাদা-কালো পশুটিকে পোষ মানানো খুবই ঝামেলাপূর্ণ হওয়ায় তা থেকে সরে আসে পশুপালকরা। আফ্রিকায় ঘোড়া পোষ মানানোর চেষ্টা করে দেখা যায়, পশুটি খুব সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত হয়। আরেকটি উদাহরণ গ্রিজলি ভল্লুক। এর মাংস কোমল ও সুস্বাদু। একেকটি ভল্লুক ওজনে প্রায় ১ হাজার ৭০০ পাউন্ড পর্যন্ত হয়। এরা মূলত তৃণভোজী। এর খাদ্যতালিকাও বিশাল। কিন্তু মানুষের বর্জ্যের প্রতি এর দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন ও গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্কে প্রায়ই ঝামেলায় পড়েন কিউরেটররা। যদি আটকা পরিবেশে তারা মানিয়ে নিতে পারত, মাংসের অসাধারণ উত্স হতো এ প্রাণী। জাপানের আইনু অধিবাসীরা গ্রিজলির শাবক পুষত। পরিণতি বুঝতে পেরে এক বছরের মাথায়ই তা পেটে চালান করে দিত। এখন পর্যন্ত পূর্ণবয়স্ক গ্রিজলি ভল্লুক পোষ মানানোর চেষ্টার কথা জানা যায়নি।

দ্রুত বড় হয় আফ্রিকার মোষ। অল্প বয়সেই এটি এক টন ওজনের দেহধারী হয়। কিন্তু প্রাণীটি হিংস্রতার জন্য গৃহপালিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। এটি আফ্রিকার অন্যতম হিংস্র প্রাণী। কখন কী করে বসে, তা কোনোভাবেই বোঝা যায় না। তার পরও যারা প্রাণীটিকে পোষ মানানোর চেষ্টা করেছে, হয় তারা নিজে মরেছে বা মোষটিকেই মেরে ফেলেছে।

আরেক প্রাণী জলহস্তী। নিরামিষাশী প্রাণীটি ওজনে চার টন পর্যন্ত হয়। একরোখা স্বভাবের কারণে এটি পোষ মানার যোগ্যতা হারিয়েছে। আফ্রিকার স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর মধ্যে মানুষ হত্যায় সবচেয়ে এগিয়ে জলহস্তী। এমনকি এ কাজে এরা সিংহকেও পেছনে ফেলেছে।

আতঙ্কিত প্রাণী: কোনো কারণে ভয় পেলে একেক শ্রেণীর প্রাণী একেকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিছু প্রাণীর স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা দিলে মুহূর্তের মধ্যে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। যেমন হরিণ ও অ্যান্টিলোপ। কিছু প্রাণী ভয় পেলেও স্নায়ুদুর্বলতায় কম ভোগে। ছোটাছুটি না করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। ছাগল ও ভেড়া এ শ্রেণীর। বেশি ভীতু পশু গৃহপালনের উপযোগী নয়। এদের বন্দি রাখলে হয় ভয়ে অক্কা পাবে কিংবা পালানোর চেষ্টা করে সীমানা প্রাচীরে মাথা কুটে মরবে। ফার্টাইল ক্রিসেন্ট এলাকায় হাজার বছর ধরে গজলা হরিণ শিকার করা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে গজলা হরিণই প্রথম গৃহপালিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর অস্থিরমতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। যে চারপেয়ে প্রাণী বিদ্যুৎবেগে ছোটে, এক লাফে ৩০ ফুট অবধি যায়, ৫০ মাইল বেগে দৌড়ায়; তাকে কীভাবে আটকে রাখা সম্ভব!

সামাজিক কাঠামো: মানুষের মতো পশুরও সামাজিক বোধ রয়েছে। যে পশু বর্তমানে গৃহপালিত, তাদের পূর্বপুরুষের কিছু সামাজিক যোগ্যতা ছিল। এরা দলবদ্ধভাবে বাস করত ও আধিপত্যপরম্পরা বজায় রাখত। যেমন বন্য ঘোড়ার পালে একটি মদ্দা, পাঁচ-ছয়টি মাদি ও তাদের শাবক থাকত। পালে সবচেয়ে মর্যাদা পুরুষ ঘোড়ার। এর পর মাদি ঘোড়াও নিজেদের মধ্যে মর্যাদা অনুসারে কর্তৃত্ব করত। এরা নতুন জায়গায় যাওয়ার সময়ও পদক্রম মেনে চলত। এভাবে কোনো বিবাদ ছাড়াই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল বুনো ঘোড়ার পালেও। গৃহপালনের জন্য গুণটি গুরুত্বপূর্ণ। গৃহপালিত ঘোড়া বিনা দ্বিধায় মানুষের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এ ধরনের প্রবণতা রয়েছে ভেড়া, ছাগল ও গরুর ক্ষেত্রে। বুনো অবস্থায় তারা সর্দারকে অনুসরণ করে। মানুষের সংস্পর্শে এলে তাদের কর্তৃত্ব মানতেও এসব প্রাণীর সমস্যা হয় না।

# অক্ষাংশ মানুষের ইতিহাস সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে

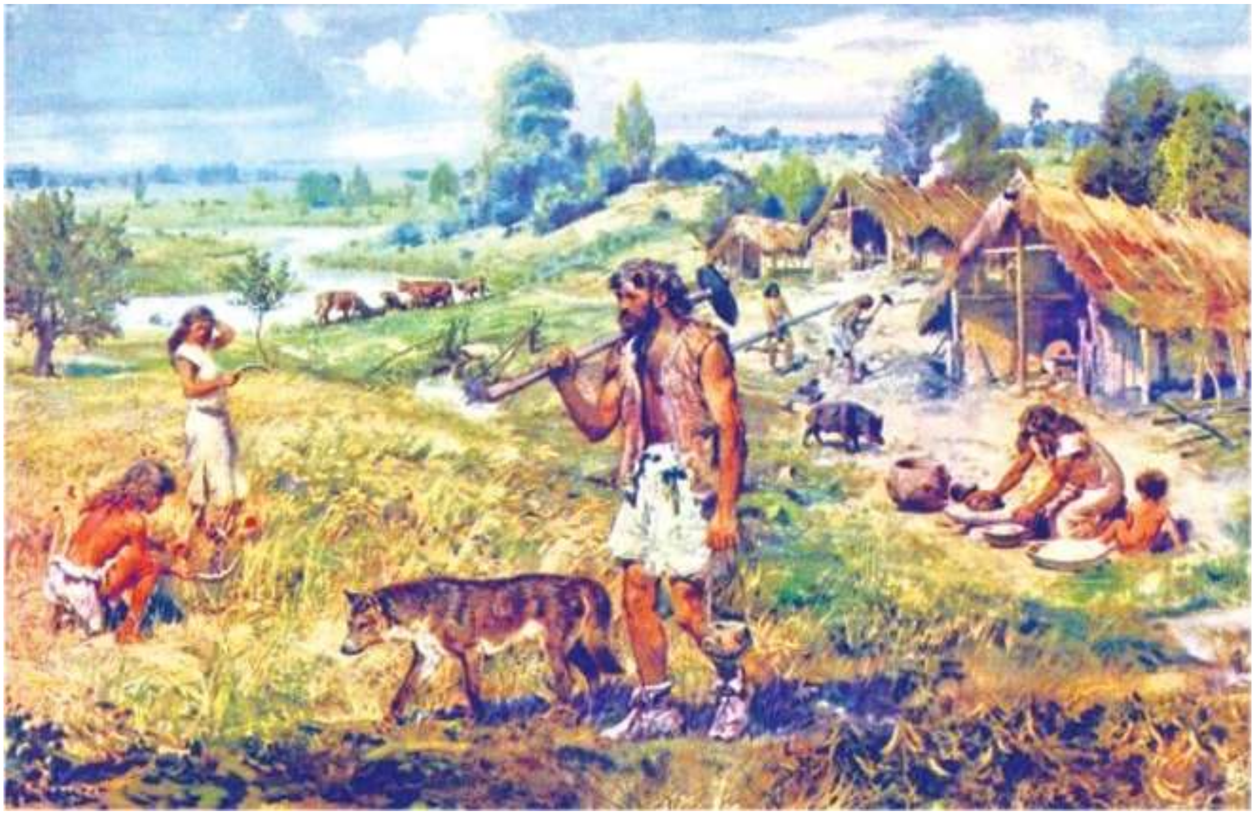

পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশগুলোর অবস্থান একেক স্থানে। কোনোটি উত্তর-দক্ষিণে, কোনোটি আবার পূর্ব-পশ্চিমে বেশি বিস্তৃত। যেমন উত্তর-দক্ষিণে আমেরিকার বিস্তার নয় হাজার মাইল। পূর্ব-পশ্চিমে তা তিন হাজার মাইলেরও কম। সবচেয়ে সরু পানামার ইসমাসে মাত্র ৪০ মাইল। আমেরিকার মূল অক্ষ (অ্যাক্সিস) উত্তর-দক্ষিণে। বিষয়টি অনেকটা একই রকম আফ্রিকার ক্ষেত্রে। এর বিপরীতে ইউরেশিয়ার বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে। অক্ষাংশের এ বিস্তার মানুষের ইতিহাস ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।

অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ এবং এর প্রভাবে চাষযোগ্য শস্য ও পোষ মানানোর উপযোগী পশুর প্রসারে তারতম্য ঘটে। একই ঘটনা ঘটে লেখনী, চাকা ও সভ্যতার অন্য নিদর্শন উদ্ভাবনে। ভূগোলের এ মৌলিক বিষয়টি গত ৫০০ বছরে আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার বাসিন্দাদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

কোনো জাতির শক্তিমত্তার প্রতীক বন্দুক, জীবাণু ও ইস্পাতের উত্থানের পেছনেও ভূমিকা ছিল কৃষিতে বিভিন্ন সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার। প্রাচীন পৃথিবীর নয়টি এলাকায় মূলত খাদ্যশস্যের চাষাবাদ শুরু হয়। আরো নির্দিষ্ট করে বললে মাত্র পাঁচটি এলাকা থেকে এর বিস্তার শুরু। এখান থেকেই শস্য, গবাদি পশু ও লালন-পালন পদ্ধতি নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উৎস ভূমিগুলো হলো দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউরোপ, মিসর ও উত্তর আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, মধ্য এশিয়া ও সিন্ধু উপত্যকা, সাহেল ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন থেকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও জাপান; মেসো আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকা।

কিছু অঞ্চল প্রাকৃতিকভাবেই নির্দিষ্ট কিছু শস্যের জন্য অন্য এলাকার তুলনায় বেশি জুতসই ছিল। আবার কিছু এলাকা যথেষ্ট জুতসই হওয়ার পরও সেখানে চাষাবাদ শুরু হয়নি। এর অন্যতম উদাহরণ অস্ট্রেলিয়া। নিউ গিনি ও ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক পরে কৃষিকাজ ও পশু লালন-পালনের কৌশল দেশটিতে পৌঁছে। একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশ থেকে দেশটির অন্তরীপে কৃষিকাজের ধারণা পৌঁছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিকাজের ধারণা বিকশিত হয়। তবে তা ছড়িয়ে পড়তে যে সময় লাগে, তা ছিল অঞ্চলভেদে বহুবিধ। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউরোপ, মিসর ও সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বার্ষিক দশমিক ৭ মাইল করে বিস্তার লাভ করে। ফিলিপাইনের পূর্ব থেকে পলিনেশিয়ার দিকে এগোয় বছরে ৩ দশমিক ২ মাইল গতিতে। সবচেয়ে বেশি এলাকাজুড়ে বিস্তার ঘটে পূর্ব-পশ্চিমে।

এর বিপরীত অবস্থান উত্তর-দক্ষিণে। বছরে গড়ে আধমাইলেরও কম করে মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত কৃষিকাজ পৌঁছে। ৯০০ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল থেকে শস্য ও শিমজাতীয় ফসল যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছতে বার্ষিক মাত্র দশমিক ৩ মাইল করে এগোয়। পেরু থেকে ইকুয়েডর পৌঁছতে লামা (গৃহপালিত প্রাণী) বছরে মাত্র দশমিক ২ মাইল করে এগোয়। মেক্সিকোয় অনেক ধরনের শস্যের আবাদ শুরু হয় ৩ হাজার ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তা না হলে আরো অনেক পরে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শস্যের চাষাবাদ শুরু হতো।

তারতম্য ছিল শস্য ও গবাদি পশুর বিস্তার নিয়েও। যেমন— যে সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ভিত্তিশস্য ও গবাদি পশু পশ্চিমে ইউরোপ ও পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় ছড়িয়ে যায়, সে সময়ের মধ্যে আন্দেজের লামা, অ্যালপ্যাকা ও গিনিপিগের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণী মেসো আমেরিকায় পৌঁছেনি। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

মেসো আমেরিকার সমাজগুলোর গঠন ছিল জটিল ও সেখানকার কৃষি ঘনত্বও বেশি ছিল। কাজেই আন্দেজের পশু ও শস্য সেখানে পাওয়া গেলে সেগুলো মেসো আমেরিকানদের খাদ্য, পরিবহন ও উলের জোগান দিত। এসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের নিজস্ব কোনো প্রাণী ছিল না বললেও চলে। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু শস্য অনেক বছর পরও মেসো আমেরিকায় পৌঁছতে পারেনি। এর মধ্যে ছিল কাসাভা, মিষ্টি আলু ও চীনাবাদাম।

পশ্চিম ইউরেশিয়া থেকেই বেশির ভাগ ভিত্তি প্যাকেজের উদ্ভব হয়েছিল। এসব উদ্ভিদ অনেক জায়গায় বুনো হিসেবে জন্মাত। এগুলো বিভিন্ন সমাজের মানুষ নিজেদের মতো করে চাষাবাদ করতে শেখে। আসলে তা-ও নয়। এর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে।

প্রথমত. ফার্টাইল ক্রিসেন্টের ভিত্তিশস্যগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বাইরে জন্মায় না। ভিত্তিশস্যের আটটির কোনোটাই মিসরে জন্মায় না (এক্ষেত্রে বার্লি ব্যতিক্রম)। মিসরের নীল উপত্যকার পরিবেশ ফার্টাইল ক্রিসেন্টের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস অববাহিকার মতোই। কাজেই ফার্টাইল ক্রিসেন্টের যেসব শস্য ভালো জন্মাত, তা নীল অববাহিকায়ও ভালো জন্মে। স্ফিংস ও পিরামিড তৈরির পেছনে ভূমিকা রাখা মানুষ যে খাবার খেত, তা মূলত ফার্টাইল ক্রিসেন্টেরই ফসল; মিসরের নয়।

দ্বিতীয়ত. যেসব ভিত্তিশস্য ফার্টাইল ক্রিসেন্টের মানুষের আওতায় আসে, নতুন করে অন্য কোথাও সেগুলোর চাষাবাদে নতুন পদ্ধতি নিয়ে কাজ হয়নি। ফার্টাইল ক্রিসেন্ট থেকে কেন এত দ্রুত শস্য অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে? এর উত্তর পাওয়া যায় পূর্ব-পশ্চিমের অক্ষাংশের বিশ্লেষণে। ভৌগোলিক অবস্থানের কল্যাণে মানচিত্রে দূরবর্তী অবস্থানে থাকার পরও অনেক জায়গার জলবায়ুতে মিল রয়েছে। এসব স্থানে দিন-রাতের পার্থক্য ও ঋতুবৈচিত্র্যেও আছে সাদৃশ্য। অবাক করা তথ্য হলেও সত্য যে,

সেখানকার রোগবালাইয়ের ধরনও একই রকম। যেমন— ইরানের উত্তরাঞ্চল, জাপান ও পর্তুগালের অবস্থান একই অক্ষাংশে। যদিও দেশগুলো একটি আরেকটি থেকে চার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।

জলবায়ুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম, বৃদ্ধি ও উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। ঋতুভেদে দিনের দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত তারতম্য ঘটায়। এসবের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ থেকে ফুল, ফল ও বীজ তৈরি হয়।

উদ্ভিদের মতো প্রাণীও জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব পড়ে মানুষের ওপর। অনেক মানুষই উত্তর মেরুর ঠাণ্ডায় টিকতে পারে না। সেখানকার কিছু জীবাণুও অসহনীয়। আবার অনেকেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উষ্ণ জলবায়ুতে টিকতে পারে না। ঔপনিবেশিকদের জন্যও এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। উত্তর ইউরোপের ঠাণ্ডা অঞ্চলের ঔপনিবেশিকরা একই জলবায়ুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। তারা বসতি স্থাপনের জন্য বেছে নেয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিউগিনি ও কেনিয়ার শীতপ্রধান অঞ্চলে। উত্তর ইউরোপের যে বাসিন্দারা নিম্নভূমির গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পাড়ি দেয়, তাদের অনেককেই ম্যালেরিয়ার মতো রোগবালাইয়ের কাছে কুপোকাত হতে হয়। অথচ এ ধরনের রোগের বিরুদ্ধে আরো আগেই প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয় সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দেহে।

নানা কারণেই ফার্টাইল ক্রিসেন্টের কৃষি পূর্ব ও পশ্চিমে দ্রুত ছড়াতে থাকে। মানুষের প্রয়োজনীয় শস্য ও পশু নতুন গন্তব্যে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেয়। ৫ হাজার ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হাঙ্গেরির সমভূমি থেকে মধ্য ইউরোপে কৃষিকাজের প্রসার ঘটে। অল্প সময়েই তা পোল্যান্ড ও হল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। যীশু খ্রিস্টের সময় ফার্টাইল ক্রিসেন্টে উদ্ভূত দানাদার শস্যের উৎপাদনকাজের বিস্তার ঘটে আট হাজার মাইলজুড়ে— পূর্বে জাপান ও পশ্চিমে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত। ইউরেশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমে এ বিস্তার ছিল পৃথিবীর দীর্ঘতম।

# ইতিহাসে বড় নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে জীবাণু

ভূরাজনৈতিক প্রভাব এবং সামরিক শক্তির বিকাশে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন পদ্ধতির ভূমিকা থাকলেও তা মূল প্রভাবক ছিল না কখনই। তাহলে কৃষিজীবী সমাজ আর আদিম শিকারি সমাজের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্যটা তৈরি হয় কোথায়?

উত্তরটা হলো জনসংখ্যায়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শিকারি ও সংগ্রহবৃত্তিনির্ভর ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি লোকের খাদ্যসংস্থান সম্ভব। ফলে কৃষিনির্ভর ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বাড়ে দ্রুতগতিতে। এ কারণে সমান শক্তিশালী দুজন কৃষক আর শিকারির লড়াইয়ে বিজয়ী পক্ষ খুঁজতে কষ্ট হলেও ১০ জন কৃষক বনাম একজন শিকারির লড়াইয়ের ফলাফল অনুমান করতে ভাবতে হয় না মোটেও। শিকারির তুলনায় কৃষক শরীরে লালন করে ভয়ঙ্করতর জীবাণু। এছাড়া প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকেও শিকার এবং সংগ্রহবৃত্তিনির্ভর সমাজের চেয়ে এগিয়ে থাকে কৃষিজীবী সমাজ।

মানবসভ্যতার জন্য কৃষি ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর উপহার হলো গবাদি পশু। অনেক সময়ই গৃহপালিত পশু থেকে অনেক রোগ মানবদেহে ছড়ায়। শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্করাও আক্রান্ত হতে পারে পশুর শরীর থেকে আসা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াসৃষ্ট রোগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রোগগুলো সেরে যায় সামান্য হাঁচি-কাশিতেই। কিন্তু কখনো কখনো তা হয়ে উঠতে পারে ধারণার চেয়েও মারাত্মক।

মানবজাতির সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে হন্তারক রোগব্যাধিগুলোর জন্য দায়ী জীবাণুগুলোর প্রতিটিরই পরজীবী হিসেবে উদ্ভব কোনো না কোনো প্রাণীর শরীরে। সেখান থেকে তারা ছড়িয়েছে মানবদেহে। খুঁজে পেয়েছে আদর্শ পোষক শরীর, বিবর্তনের ধারায় নিজেদের করে তুলেছে সেখানে বসবাস ও বংশবিস্তারের উপযোগী। বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সময়ে এ রোগব্যাধিগুলো ছিল মানবেতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘাতক। কখনো কখনো এরা উজাড় করে দিয়েছে জনপদের পর জনপদ, শহরের পর শহরকে বানিয়ে তুলেছে শ্মশান।

এত বড় ঘাতক বলেই মানুষের ইতিহাসে তারা পালন করতে পেরেছে বড় নির্ধারক ভূমিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে লড়াইয়ের ময়দানে ফলাফল নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে রোগ-জীবাণু।

ইতিহাসে রোগ-জীবাণুর ভূমিকার উদাহরণ টানার জন্য আমাদের তাকাতে হবে ১৪৯২ সালে; কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের মাধ্যমে যখন শুরু হয়েছিল ইউরোপীয়দের আমেরিকা দখলের ইতিহাস। আর সে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্প্যানিশ কনকিস্তাদোরদের হাতে আমেরিকার আদিবাসী নিধনযজ্ঞ। এ নিধনযজ্ঞে স্প্যানিশ বারুদ বা ইস্পাতের চেয়েও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে ইউরোপ থেকে বয়ে আনা জীবাণু; যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ দাঁড় করানোর সামর্থ্য ছিল না ইনকাদের।

সেক্ষেত্রে নতুন একটা প্রশ্নের অবকাশ তৈরি হয়। সেটা হলো, স্প্যানিশরা কেন ইনকাদের কাছ থেকে আসা কোনো মহামারীর শিকার হয়নি? কেন কনকিস্তাদোরদের মাধ্যমে বাহিত কোনো মহামারী মুছে দিল না ইউরোপের ৯৫ শতাংশ জনসংখ্যা? যা ইনকাদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তা ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে ঘটতে বাধা ছিল কোথায়?

উত্তরটা লুকিয়ে আছে মানবজাতির বিকাশের প্রকৃতিতে, আর জীবজগতের বিবর্তনের নিয়মে।

## মহামারীর বিবর্তন

সাধারণত জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতির মতোই ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিতে টিকে আছে বিবর্তনের ধারায়। আর বিবর্তনে টিকে থাকার শর্ত হলো দ্রুত বংশবিস্তার ও ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা।

জীবাণুর ক্ষেত্রে এ ছড়িয়ে পড়াকে সংজ্ঞায়িত করা যায় সাংখ্যিক হিসাবে। তার জন্য শুধু গুনে নিলেই হলো, এদের সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছে কতজন মানুষ। তবে এ সংখ্যার বিস্তার আবার নির্ভর করে সংক্রমণের গতির ওপর।

কিছু জীবাণু আছে, যেগুলো ছড়িয়ে পড়ার জন্য কোনো কিছু করার দরকার হয় না। তার বাহকরাই নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয় ছড়িয়ে পড়ার ভার। এক্ষেত্রে জীবাণুগুলোর জন্য থাকে কেবল অপেক্ষার পালা, কখন তাদের বর্তমান বাহক পরিণত হয় নতুন বাহকের খাবারে।

যেমন সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া। মানুষ এর শিকারে পরিণত হয় এর দ্বারা আক্রান্ত পশু বা পাখির ডিম কিংবা মাংস খেয়ে। যেকোনো মাছ বা মাংস ভালোমতো রান্না না করে খেলে ঘটে ফিতাকৃমির সংক্রমণ। এ কারণে আজকাল জাপানি সুসি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই। নিউগিনির নরমাংসভোজীদের মধ্যে দেখা যায় হাসি রোগের (লাফিং ডিজিজ-কুরু) প্রাদুর্ভাব; যা ছড়ায় মানুষের কাঁচা মাংস বা মগজের মাধ্যমে।

জীবাণু সংক্রমণের আরেকটি পদ্ধতি বাহকের লালায় ঘাপটি মেরে থাকা। এক্ষেত্রে সাধারণত বাহকের কাজ করে মশা, মাছি, সেতসি, উকুন বা ছারপোকাজাতীয় কীটপতঙ্গ; যেগুলো সংক্রমিত কোনো মানুষ বা পশুর রক্ত খেয়ে চুমুক লাগায় নতুন প্রাণীর শরীরে। এতে সংক্রমিত হয় নতুন কোনো পশু বা মানুষ। এভাবেই ছড়ায় ম্যালেরিয়া, প্লেগ, টাইফাস অথবা ঘুম রোগ (আফ্রিকায় সেতসির আক্রমণে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়)।

পরোক্ষ জীবাণু সংক্রমণের সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম উদাহরণ হলো মায়ের মাধ্যমে গর্ভস্থ শিশুতে সংক্রমণ। এ পদ্ধতিতে ছড়ানো জীবাণুগুলোর দ্বারা সৃষ্ট রোগ হয় আরো ভয়ঙ্কর— সিফিলিস, রুবেলা, এইডস...।

প্রত্যক্ষ সংক্রমণের ক্ষেত্রে জীবাণুগুলো নিজেরাই নিজেদের ছড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এর মধ্যে কিছু কিছু আছে, যেগুলো আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকের স্পর্শের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় সুস্থ ব্যক্তির শরীরে। সিফিলিস, গুটিবসন্তসহ নানা চর্মরোগের জীবাণু ছড়ায় এভাবেই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি ও হুপিং কাশির জীবাণু সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায় নতুন কোনো ব্যক্তির শরীরে। কলেরাসহ পানিবাহিত রোগের জীবাণুগুলো পানিতে ছড়ায় আক্রান্ত রোগীর ডায়রিয়ার মাধ্যমে। কোরিয়ান হেমোরেজিক জ্বরের জীবাণুর উৎস হলো এক ধরনের ইঁদুরের মূত্র। জলাতঙ্কের ভাইরাস আক্রান্ত পশুকে আশপাশের মানুষ বা অন্যান্য পশুকে কামড়াতে বাধ্য করে।

এখন বিষয় হলো, এ জীবাণুগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?

এসব রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে মানবদেহে রয়েছে নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যেমন— কারো জ্বর দেখা দিলে আমরা ধরে নিই, তা হলো সাধারণ অসুস্থতা বা কোনো রোগের লক্ষণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হলো আরো বেশি কিছু। জ্বরাক্রান্ত হওয়ার অর্থই হলো তাপ সংবেদনশীল হানাদার জীবাণুগুলোকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চালাচ্ছে শরীর।

রক্তের শ্বেতকণিকার কাজ হলো শরীরের বাইরে থেকে আসা জীবাণু খুঁজে খুঁজে মারা। আবার কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তার প্রভাবে একবার সেরে উঠলে আর কখনো ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

কোনো জনগোষ্ঠী একবার মহামারীতে আক্রান্ত হলে সেখান থেকে সেরে ওঠা অংশ কখনো কখনো জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শরীরে তৈরি করে নেয় সেই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। আবার এ পরিবর্তন কখনো কখনো ঘটে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা এ পরিবর্তন দাঁড়ায় মানবশরীরের সবচেয়ে মন্থর প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে।

কখনো কখনো জীবাণুগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিজেদের জিনে এমন পরিবর্তন নিয়ে আসে, আমাদের শরীরের অ্যান্টিবডিগুলো তাদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয় না। আবার কোনো কোনো জীবাণু প্রথমেই ধ্বংস করে বসে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যেমন এইডসের জীবাণু।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে মহামারী আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়লে নিহত হয় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ; সভ্যতার ইতিহাসে যা ভয়ঙ্করতম ঘাতক মহামারীর নিদর্শন। ১৩৪৬-৫২ সালের মধ্যে বিউবোনিক প্লেগে নিহত হয় ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ মানুষ। সে সময় কোনো কোনো শহরে ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় নিহতের সংখ্যা। ১৮৮০ দশকের শুরুর দিকে কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলরোড স্থাপনের সময় শ্বেতাঙ্গদের বয়ে আনা জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। প্রতি বছর মারা পড়তে থাকে গড়ে ৯ শতাংশের বেশি ইন্ডিয়ান।

কোনো রোগকে মহামারী হয়ে উঠতে হলে তার জন্য দরকার বিপুল জনসংখ্যা। তার মানে এই নয়, ছোট ছোট বসতিতে রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় না। দেখা দেয়, কিন্তু তাও খুবই নির্দিষ্ট প্রকৃতির; যার মধ্যে বেশকিছু জীবাণু নিজেদের টিকিয়ে রাখে মাটিতে কিংবা আশপাশের অন্যান্য প্রাণীর শরীরে। এ কারণে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, বরং নিয়মিতভাবেই মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। এগুলোই মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতম রোগগুলোর নিদর্শন। এ রোগগুলোর কাছাকাছি রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে প্রাণিজগতে আমাদের নিকটাত্মীয় গরিলা অথবা শিম্পাঞ্জিকে।

মানুষের ভেতর যেসব রোগ মহামারী হয়ে উঠেছে, সেগুলোর প্রতিটিরই উদ্ভব নগরসভ্যতা অথবা ঘনবসতিতে। ১০ হাজার বছর আগে কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের মধ্য দিয়ে এগুলোর পথ করে নেয়ার জায়গা তৈরি হয় এবং নিজেদের চেনাতে শুরু করে নগরসভ্যতা শুরুর পর থেকে।

বর্তমানের চেনা মহামারীর জীবাণুগুলোর আক্রমণের প্রাচীনতম নিদর্শনও খুব একটা পুরনো নয়; বরং খুবই সাম্প্রতিক, খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ সালের দিককার। সে সময়কার এক মিসরীয় মমির গায়ের দাগ পরীক্ষার পর মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় গুটিবসন্ত। এ রোগের চেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মাম্পসের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বে, কুষ্ঠের প্রাচীনতম নিদর্শন ২০০ খ্রিস্টপূর্ব আমলের, পোলিও ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ও এইডস ১৯৫৯ সালে।

শিকারি বা সংগ্রহবৃত্তিনির্ভর সমাজ, এমনকি ছোট ছোট কৃষিজীবী গোত্রের ভেতরে এ জীবাণুগুলোর বিকাশের কোনো সুযোগই ছিল না। এরা যতবারই এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে, দেখা গেছে, তার উৎস হলো বাইরের নগরসভ্যতা বা ঘনবসতি থেকে আসা কোনো মানুষ। বহিরাগত ইউরোপীয়দের নিয়ে আসা রোগই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অ্যামাজন অববাহিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর বেশকিছু ছোট ছোট গোত্র। উদাহরণ— ১৯০২ সালে এক তিমি শিকারি জাহাজের নাবিকের বয়ে আনা ডায়রিয়ার জীবাণুর কারণে মারা যায় কানাডীয় আর্কটিকের সাউদাম্পটন দ্বীপের অধিবাসী ৫১ জন স্যাডলারমিউট আদিবাসী; যাদের সংখ্যাই ছিল মাত্র ৫৬।

# নগরায়ণ ও বাণিজ্যপথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে জীবাণু

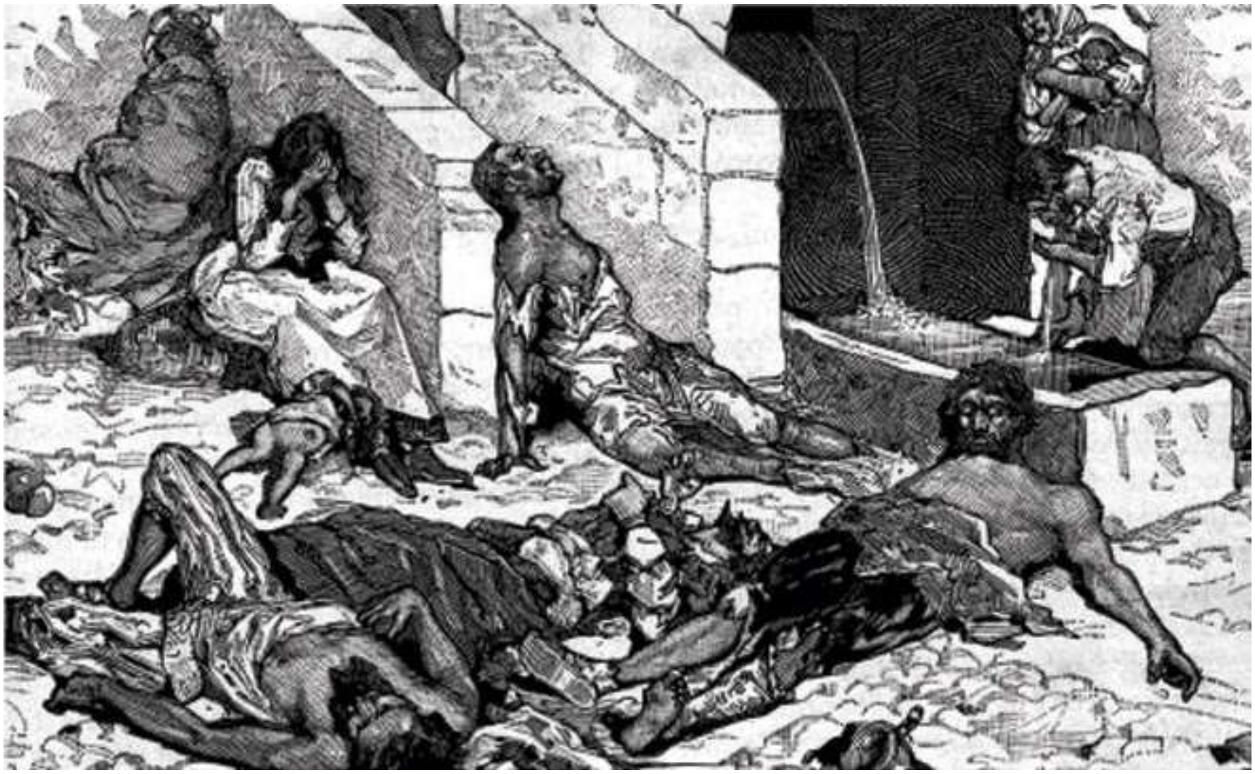

কৃষির বিকাশের সঙ্গে মহামারীর সম্পর্কটা আসলে কোথায়? আগেই জেনেছি, শিকারি-সংগ্রহবৃত্তিনির্ভর সমাজের তুলনায় কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থায় বেশি লোকের সংস্থান সম্ভব। এর বাইরেও শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন যাযাবরের। বেঁচে থাকার তাগিদেই তাদের ঘুরে বেড়াতে হয় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় তাদের মল-মূত্র-আবর্জনা পড়ে থাকে পেছনে। শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনে এক স্থানে এত কম সময় থাকতে হতো যে, নতুন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিয়ে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠার মতো শক্তি অর্জনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে একই স্থানে থিতু ও দীর্ঘস্থায়ী জীবনযাপনে বাধ্য থাকে কৃষক। আর তাদের মল-মূত্র-আবর্জনাও একই স্থানে জমতে থাকে বছরের পর বছর ধরে; জীবাণু যেখানে জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার এবং বাতাসে বা পানিতে ছড়ানোর মতো সময় পায় যথেষ্ট।

কৃষিনির্ভর সমাজে জীবাণুর জন্য ছড়িয়ে পড়া আরো সহজ হয়ে ওঠে, যখন জমিতে সার দিতে গিয়ে এসব আবর্জনা ছিটানো হয় অনেকের কর্মস্থল তথা কৃষিজমিতে। সেচ ব্যবস্থা ও মত্স্য চাষের ফলে কৃষক পানিবাহিত রোগের জীবাণু ও কৃমির সংস্পর্শে আসে। শুধু নিজেদের আবর্জনা নয়, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী একই সঙ্গে থাকে পশু-পাখিবাহিত জীবাণুর আক্রমণের ঝুঁকিতে।

জীবাণুর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠায় আরো বড় ভূমিকা রেখেছে নগরায়ণ। জনবসতি ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরো কঠিন হয়ে পড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা। ইউরোপের শহরগুলোয় ২০ শতকের শুরু পর্যন্ত মহামারীতে নিহত জনসংখ্যা পূরণ হয়েছে গ্রাম থেকে আসা স্বাস্থ্যবান কৃষকদের দ্বারা।

জীবাণুর সর্বব্যাপী হয়ে ওঠার জন্য দায়ী আরেকটি ঘটনা হলো বাণিজ্যপথের বিকাশ। রোমানদের হাতে যা পরিণত হয়েছে ইউরোপ, এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত এর বেড়ে ওঠা এবং সংক্রমিত হওয়ার এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে। রোমে ১৬৫ ও ১৮০ খ্রিস্টাব্দে মহামারী আকারে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়ার এটাই ছিল কারণ। ইউরোপে প্রথমবারের মতো বিউবোনিক প্লেগ এভাবেই পৌঁছে ৫৪২ খ্রিস্টাব্দে। যদিও সর্বোচ্চ প্রাণঘাতী চেহারা দেখা যায়নি ১৩৪৬ সালের 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর আগ পর্যন্ত; যার জন্য দায়ী ছিল সে সময় ইউরেশিয়ার পূর্ব-পশ্চিম অক্ষ দিয়ে চীন থেকে আসা ভেড়ার লোম।

জনসংখ্যা ও এর ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মহামারীর আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে একটা নতুন প্রশ্ন জাগতে পারে, নগরায়ণের আগে কি এসব জীবাণুর কোনো অস্তিত্বই ছিল না?

এ ধরনের রোগের জীবাণুর আণবিক গঠন পরীক্ষা করে বের করা গেছে এর সমগোত্রীয় জীবাণুর পরিচয়। মজার বিষয় হলো, এ সমগোত্রীয় জীবাণুগুলোতেও পাওয়া গেছে ভয়াবহ রোগের কারণ হয়ে ওঠার লক্ষণ। তবে এগুলো সাধারণত গৃহপালিত প্রাণীনির্ভর এবং সেখানেই সীমাবদ্ধ এর কার্যকারিতা।

যেদিন থেকে আমরা গরু বা শূকরের মতো প্রাণী পালন শুরু করেছি, সেদিন থেকেই নিজেদের এনেছি এদের শরীরবাহিত জীবাণুর আক্রমণের আওতায়।

প্রতিদিন প্রচুর গৃহপালিত জীবজন্তুবাহিত জীবাণু আমাদের শরীরের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু আমাদের শরীরে বসবাসের উপযোগী করে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে পেরেছে খুব সামান্যই।

এ বিবর্তনের জন্য পার হয়ে আসতে হয় চারটি ধাপ। প্রথম ধাপে গৃহপালিত বা বন্য পশুর সংস্পর্শে আমাদের শরীরে আসা জীবাণু খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। এগুলো সরাসরি ছোঁয়াচে নয় এবং এর সংস্পর্শের ফলে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও খুব কম।

দ্বিতীয় ধাপে এরা নিজেদের জিনগত গঠন এমনভাবে পরিবর্তন করে নেয় যে, একবার জায়গা করে নেয়ার পর এগুলো একজন থেকে আরেকজনের শরীরে সহজেই ছড়িয়ে যেতে পারে। ছোঁয়াচে প্রবণতার কারণে এগুলো একসময় হয়ে ওঠে বড় মহামারীর কারণ। সাধারণত একবার মহামারীর পর আক্রান্তদের মৃত্যু অথবা শরীরে ওই জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা তৈরি হওয়ার কারণে একসময় এর প্রাদুর্ভাব থেমে যায়।

তৃতীয় আরেকটি ধাপ তৈরি হয়, যখন প্রাণীর শরীর থেকে আসা জীবাণুগুলো একবার মহামারী সৃষ্টি করেই দ্বিতীয় ধাপের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না এবং দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে কোনো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি ছাড়াই।

চতুর্থ ধাপে জীবাণু হয়ে পড়ে পুরোপুরি মানবশরীরকেন্দ্রিক। এগুলোর কারণে সৃষ্ট রোগ বা মহামারীর নেতিবাচক প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে মানবশরীরেই।

এ জীবাণুগুলোর গুরুত্ব বোঝা যায় আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয়দের হাতে উপনিবেশ স্থাপন এবং সেখানকার স্থানীয়দের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ইতিহাসের দিকে তাকালে। ওই মহাদেশে স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে যতজন ইউরোপীয়দের তলোয়ার কিংবা বন্দুকের কারণে মারা গেছে, তার চেয়ে বেশি মারা গেছে এদের বয়ে নিয়ে আসা জীবাণুর আক্রমণে। ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা এসব মহামারীর কারণে হারিয়েছে তাদের নৈতিক শক্তি। যুদ্ধের আগেই লোকক্ষয় অনেকাংশে কমিয়ে এনেছে এদের প্রতিরোধের স্পৃহা ও সামর্থ্য।

হুয়ান কর্তেজ ১৫১৯ সালে মেক্সিকোর উপকূলে যখন অবতরণ করেন, তার সঙ্গে ছিল মাত্র ৬০০ স্প্যানিশ যোদ্ধা। অন্যদিকে অ্যাজটেকদের শুধু সৈন্য সংখ্যাই ছিল কয়েক লাখের বেশি। অ্যাজটেক রাজধানী তেনোচতিতলানে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয় কর্তেজকে। সঙ্গে জ্যান্ত ফিরতে পারা সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০-এর মতো। যারা ফিরতে পেরেছিল, শুধু সরল অ্যাজটেকদের ইউরোপীয়দের সঙ্গে লড়াইয়ে অনভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সুবিধায় এগিয়ে থাকার কারণে।

কর্তেজের পরবর্তী আক্রমণ যখন এল, তত দিনে বেড়েছে অ্যাজটেকদের অভিজ্ঞতা। তাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়িয়েছিল নগরযুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধে স্প্যানিশরা এগিয়ে যায় অ্যাজটেকদের ভেতর গুটিবসন্তের মহামারী দেখা দেয়ায়। কিউবা থেকে আসা একজন ক্রীতদাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এ মহামারীর বীজ। মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় স্থানীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি মানুষ; যার মধ্যে অ্যাজটেক সম্রাট কুইতলাহুয়াকও ছিলেন।

রহস্যময় মহামারীর কারণে এতজন স্থানীয়র বিপরীতে একজন স্প্যানিশও না মরায় ভয় পেয়ে যায় অ্যাজটেকরা। ঘটনাটি ছিল তাদের মনোবলের ওপর বেশ বড় ধরনের আঘাত। এ যেন তাদের সামনে হানাদার স্প্যানিয়ার্ডদের অপ্রতিরোধ্যতার এক দৈব বিজ্ঞাপন। একই রকমভাবে ইনকাদের বিরুদ্ধে পিজারোর যুদ্ধজয়েও ভূমিকা রাখে গুটিবসন্তের জীবাণু।

ইউরোপ ও নিউ ওয়ার্ল্ডের (আমেরিকা মহাদেশ) লড়াইয়ের বাইরেও মানবসভ্যতার ইতিহাসে পশুবাহিত জীবাণু ভূমিকা রেখেছে অনেক। পৃথিবীর আরো অনেক অঞ্চলের জনগণের ওপর ইউরেশীয় মহামারী হেনেছে প্রলয়ঙ্করী আঘাত। এর দ্বারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপবাসী জনগোষ্ঠী, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় হটেনটট ও বুশম্যান উপজাতির লোকজন। কোনো অঞ্চলের নতুন কোনো জনগোষ্ঠীকে আক্রমণের সময় এ জীবাণুগুলো প্রতিবারেই মৃত্যুহার তুলে নিয়ে গেছে ৫০ থেকে ১০০ শতাংশে।

১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন হিসপানিওলায় পৌঁছেন, তখন সেখানকার জনসংখ্যা ছিল ৮০ লাখের বেশি। ইউরোপ থেকে নিয়ে আসা জীবাণুর কল্যাণে ১৫৩৫ সালে তা নেমে দাঁড়ায় শূন্যে। ১৮৭৫ সালে ফিজির এক গোত্রপতি গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখান থেকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন হামের জীবাণু। এর পর মহামারী দেখা দিলে তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ফিজির তত্কালীন জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। এ জনসংখ্যা আবার তার আগে ১৭৯১ সালে এ অঞ্চলে প্রথম ইউরোপীয় পা রাখার পর থেকে বিভিন্ন মহামারীর কারণে নেমে দাঁড়িয়েছিল অর্ধেকেরও নিচে। হাওয়াইয়ে প্রথম সিফিলিস, গনরিয়া, যক্ষ্মা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু আসে ১৭৭৯ সালে ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে চড়ে। ১৮০৪ সালে প্রথম এ অঞ্চলে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে টাইফয়েড। তত দিনে হানা দিয়েছে আরো বেশকিছু ছোটখাটো মহামারী। ফলাফল দাঁড়ায় ১৭৭৯ সালে হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লাখের মতো। ১৮৫৩ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৮৪ হাজারে। সেখানে একই বছরে গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিলে নিহত হয় আরো ১০ হাজার হাওয়াইয়ান।

অন্যান্য অঞ্চলে ইউরোপীয়রা যেভাবে মহামারীর সুবিধা নিয়েছে, তেমনি এর শিকারেও পরিণত হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে তারা শিকার হয়েছে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও পীতজ্বরের। এ কারণে এ অঞ্চলগুলো শাসন করতে পারলেও পুরোপুরি উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়নি তারা।

অন্যান্য মহাদেশ জয় করতে গিয়ে ইউরোপীয়রা প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের সুবিধা পেলেও তাদের বিজয় সম্পূর্ণ করতে ভূমিকা রেখেছে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া জীবাণু; যার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার দীর্ঘ বিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে গৃহপালিত পশুর সঙ্গে ইউরেশীয়দের দীর্ঘকালীন সংস্রব।

# জ্ঞানই ক্ষমতার উৎস

উনিশ শতকের পণ্ডিতরা ইতিহাসকে দেখেছেন ‘অসভ্যতা’ থেকে ‘সভ্যতায়’ রূপান্তরের সময় হিসেবে। কিন্তু খুব সহজ ভাষায় তা বলা সম্ভব নয়। এ পরিবর্তনের মধ্যে ছিল কৃষি, ধাতুবিদ্যা, জটিল প্রযুক্তি, কেন্দ্রীভূত সরকার ও লেখনীর মতো বিদ্যার উদয়। বিষয়গুলোর মধ্যে ভৌগোলিকভাবে সবচেয়ে সীমাবদ্ধ ছিল লেখনী কৌশল। ইসলাম ও ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ ছড়িয়ে পড়ার আগে লেখার কৌশল গুটি কয়েক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখনো লেখার কৌশল অজানা ছিল অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও নিরক্ষীয় আফ্রিকায়। নিউ ওয়ার্ল্ডের কেবল মেসো আমেরিকার অল্প কিছু জায়গায় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ এ নিদর্শনের সীমিত প্রচলন ছিল। এ কারণে যারা নিজেকে সভ্য বলে দাবি করেন, তারা লেখনী কৌশলকে ‘সভ্য’ ও ‘বর্বরের’ মধ্যে পার্থক্যের সূত্র বলে মনে করেন।

জ্ঞানই ক্ষমতার উৎস। আর জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তত্ত্বের লিখিত রূপ। যেকোনো বিষয় লিখিত রাখা হলে তা হাজার মাইল দূরেও নিরেটভাবে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এমনকি হাজার বছর পরও তা উত্তরসূরিদের তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ইস্পাত ও মহামারীর মতো বিষয়গুলোও লেখনী শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল ইনকারা।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের হাত ধরেও লেখনী এগিয়ে চলে। যে সম্রাট ও বণিকরা উপনিবেশ তৈরির জাহাজ ভাসাতেন, তারা লিখিত রূপেই নির্দেশনা দিতেন। পূর্ববর্তী কোনো জাহাজের নাবিকরা পথনির্দেশনা লিখে রাখতেন, তা অনুসরণ করেই উত্তরসূরিরা পথ চলতেন। লিখিত এ নির্দেশনার সবচেয়ে সেরা রূপ মানচিত্র। পূর্বসূরি নাবিকের লিখিত নির্দেশনা ভবিষ্যত্ প্রজন্মকে দারুণ উত্সাহিত করত। অনেকেই নতুন গন্তব্যে বিপুল রত্নভাণ্ডারের খবর দিয়ে গেছেন। কিন্তু নিজেরা সেখানে পৌঁছতে পারেননি। এসব তথ্যের লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করে সেখানে হাজির হয়েছেন উত্তরসূরিরা।

লিখিত রূপে তথ্য ছড়ানোর এ কৌশল আদি মানবরা অন্যভাবে অনুসরণ করত। কিন্তু সেগুলোর অর্থ প্রকাশের কৌশল নিখুঁত ছিল না। কেন সব সমাজ তথ্য লিখে রাখার কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি? কোনো শিকারি-সংগ্রাহক সমাজই লিখে রাখার কথা ভাবতেও পারেনি কেন? গ্রিসের ক্রেট দ্বীপের লোক লিখতে শেখে, কিন্তু পলিনেশিয়ায় টোঙ্গার লোকেরা কেন তা শেখেনি? পৃথিবীর কতগুলো প্রান্তে আলাদা আলাদাভাবে লেখার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে কেন? এ কাজে বিভিন্ন সমাজের লোক কেন এগিয়ে যায় বা পিছিয়ে পড়ে? হালের প্রায় সব জাপানি ও স্ক্যান্ডিনেভীয় শিক্ষিত। কিন্তু ইরাকিরা তা নয় কেন? অথচ চার হাজার বছর আগে ইরাকের আশপাশের সভ্যতায়ই লেখার উদ্ভব ঘটে।

লেখার কৌশল উদ্ভাবনের পর তা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা নিয়েও রয়েছে চিন্তার সুযোগ। কেন ফার্টাইল ক্রিসেন্ট থেকে শুরু হয়ে তা ইথিওপিয়া ও আরবে ছড়িয়ে পড়ে? কেন মেক্সিকো থেকে আন্দেজে নয়? লেখালেখির কৌশল এক সমাজ অন্যের কাছ থেকে রপ্ত করে নাকি সবাই নিজের মতো কৌশল উদ্ভাবন করে? এমন নানা প্রশ্নই মানুষের মনে হাজির হতে পারে। সীমিত কিছু পদ্ধতি জানা থাকলে তা দিয়ে সব ভাষা লিখে প্রকাশ করা যায় না। বিভিন্ন সভ্যতায় প্রযুক্তি, ধর্ম ও খাদ্য উত্পাদন যেভাবে প্রসার পেয়েছে, লেখালেখির প্রসারও তেমনই বিস্তর। এর সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক ইতিহাসও।

তিনটি মৌলিক কৌশলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষার লিখিত রূপের পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। প্রথমত. বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য, তার মূলে রয়েছে মৌখিক উচ্চারণের ভিন্নতা। এ পার্থক্য ধরা পড়ে মৌলিক উচ্চারণ, সিলেবল ও পদের ক্ষেত্রে। এখন ভাষার তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে গেলে সবচেয়ে বড় পার্থক্য দেখা যাবে বর্ণমালার লিখিত রূপে। পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাষায় গড়ে ২০-৩০টি বর্ণ রয়েছে। কিছু ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি ধ্বনি (ফোনিম) থাকে। যেমন ইংরেজিতে বর্ণ ২৬টি কিন্তু ধ্বনি রয়েছে প্রায় ৪০টি। একাধিক বর্ণ একীভূত করে অন্য ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। যেমন ইংরেজিতে ‘ঝঐ’ কিংবা ‘ঞই’ যোগ করে কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। এগুলোর লিখিত বর্ণ নেই। কিন্তু রুশ কিংবা গ্রিক ভাষায় এসবের লিখিত রূপ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত. ভাষাতত্ত্বে লোগোগ্রাম নামে একটি বিষয় রয়েছে। এর অর্থ হলো, একটি মাত্র প্রতীকই পুরো একটি শব্দ প্রকাশ করে। চীনা ও জাপানি ভাষায় এমন অসংখ্য নজির রয়েছে। জাপানি লিখন পদ্ধতির নাম কানজি। ভাষায় বর্ণমালার সংগঠিত বিকাশের আগে মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিক, মায়া গ্লিফ ও সুমেরীয় কিউনিফর্মে লোগোগ্রামের ব্যবহার ছিল।

তৃতীয়ত. খুবই কম পরিচিত একটি কৌশল রয়েছে, যার নাম সিলেবারি। এটিও প্রাচীন যুগে বহুল ব্যবহার হতো। বর্তমানে বেশির ভাগ লিখনশৈলী এ পদ্ধতিতে ঘটে। এতে একটি ব্যঞ্জনবর্ণের পর স্বরবর্ণ বসিয়ে সিলেবল গঠন করা হয়। এভাবে একাধিক সিলেবল বসিয়ে তৈরি হয় শব্দ। যেমন ইংরেজি শব্দ ‘ফ্যামিলি’। এতে তিনটি স্বরবর্ণ যথাক্রমে তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণকে অনুসরণ করেছে। মাইসেনি গ্রিসে লিখন পদ্ধতি সিলেবারিনির্ভর ছিল। জাপানে কিছুদিন আগেও টেলিগ্রাম, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও অন্ধদের টেক্সটের জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার ছিল।

আলোচিত এ তিন বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলা যাবে না। এগুলোকে কৌশল বলা চলে। বর্তমানে প্রায় সব ভাষায়ই কোনো না কোনোভাবে তিনটি কৌশলের সমন্বয় করা হয়। চীনা ভাষা যেমন পুরোপুরি লোগোগ্রাফিক নয়, তেমনি ইংরেজি ভাষাও শতভাগ বর্ণমালানির্ভর নয়। ইংরেজিতে লোগোগ্রামের উদাহরণ হিসেবে ট, % ও + এর ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলোর ব্যবহার ধ্বনিতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিকে যেমন সিলেবিক চিহ্ন ছিল, তেমনি ছিল আলাদা আলাদা বর্ণ।

# সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ লিখিত ভাষা

পৃথিবীর সব সমাজ নিজেরাই ভাষার লিখিত রূপ উদ্ভাবন করেনি। অনেকে অন্যদের কাছ থেকে ধার করেছে। কেননা শূন্য থেকে পুরো নতুন একটি ভাষা উদ্ভাবন করা দুরূহ। ভাষা-সংক্রান্ত বিষয়ে হালের মানুষ যেগুলোকে অবশ্যপালনীয় বলে মেনে নিয়েছে, সেগুলো কারো না কারো মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। শুরুর দিকে মৌখিক ভাষাকে লিখিত রূপ দিতে নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে হয় মানুষকে। মুখে উচ্চারিত একটি শব্দ লিখিত রূপে কীভাবে ছোট ছোট অংশে ভাগ হবে, তা নিয়ে চিন্তা করতে হয়। শুরুতে এগুলো ধ্বনি, সিলেবল বা পদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি। লিখিত রূপ তৈরিতে শব্দ বা বাক্যের একই ধরনের উচ্চারণ, স্বরসঙ্গতি, শব্দগুচ্ছ নির্ধারণ, ব্যক্তিবিশেষে শব্দের ব্যবহারে পার্থক্যসহ নানা বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো। লিখিত রূপে এত বৈচিত্র্য প্রকাশ করা অসম্ভব।

যেভাবেই হোক, এসব বৈচিত্র্য উপেক্ষা করেই কোনো ভাষার প্রাথমিক পর্যায়ের লিখিত রূপ নির্ধারণ হয়। জটিলতার কারণেই সব জাতি নিজস্ব ভাষা পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারেনি। অবিসংবাদিতভাবে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ যে দুটি অঞ্চলে লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন, তা হলো ৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতা ও ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মেক্সিকোর সভ্যতা। মিসরীয় ও চীনা সভ্যতার লিখন কৌশলকেও অনেকটাই স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বলা যায়। এছাড়া যে সভ্যতায় লেখার কৌশল উদ্ভাবন হয়েছে, তারা কোনো না কোনোভাবে অন্য সভ্যতার লিখন কৌশলই অবলম্বন ও অনুসরণ করেছে। কিংবা তাদের দেখে উৎসাহিত হয়েছে।

ইতিহাস ঘেঁটে যত দূর জানা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো লিখন কৌশল সুমেরীয় কিউনিফর্ম। এ ভাষার লিখিত উপাদানগুলো চূড়ান্ত রূপ পায় হাজার বছরে। এ সভ্যতায় বাসিন্দারা পণ্য বিনিময়ের জন্য কাদামাটির তৈরি প্রতীক ব্যবহার করত। ভেড়া গণনা কিংবা শস্যের পরিমাণ নির্ধারণেও ছিল এসবের উপযোগিতা। এ চিহ্নগুলো পরবর্তীতে ভাষার অংশে পরিণত হয়। আরো পরে শুরু হয় কাদামাটির ফলকে নানা সংকেত লিখে রাখার প্রচলন। খুঁচিয়ে দাগ কাটার মতো উপকরণ দিয়ে এসব ফলকে তথ্য রাখা হতো। কলম হিসেবে কদর ছিল শক্ত নলখাগড়ার।

একসময় বর্ণের আকার ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। আনুভূমিক রেখায় লেখা বাম থেকে ডানে যাবে বলে নির্ধারিত হয়। এ ধারা সুমেরীয় ও ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এভাবে বিভিন্ন ভাষার লিখিত রূপের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। কিছু ভাষায় লেখা শুরু হয়ে ক্রমে নিচের দিকে নামে। আবার কিছু ভাষা ডান থেকে বামে।

সুমেরীয় উরুক শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে হাজারো পোড়া মাটির ফলক পাওয়া গেছে। এগুলো থেকে লিখিত ভাষার বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। আধুনিক বাগদাদের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফোরাত নদীর তীরে উরুকের অবস্থান। শুরুর দিকে সুমেরীয় অঞ্চলে লিখিত রূপে কোনো কিছু বোঝাতে ওই বস্তুর ছবি আঁকা হতো। যেমন পাখি বা মাছ বোঝাতে এগুলোর ছবি আঁকত তারা। এতে বাক্য গঠনে সীমিত কিছু বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক প্রতীক দেখা যেত। জটিলতা দেখা দিত অর্থের বোধগম্যতা নিয়ে। সহজ কথায় এটি ছিল টেলিগ্রামের ভাষার মতো, যেখানে বৈয়াকরণিক উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। পর্যায়ক্রমে প্রতীকগুলো পরিবর্তন হতে থাকে। বিশেষ করে যখন ‘নলখাগড়ার কলমের’ পরিবর্তে আরো আধুনিক উপকরণের আবির্ভাব ঘটে। পুরনো দুটি প্রতীকের সমন্বয়ে তৈরি হয় নতুন প্রতীক। যেমন মানুষের ‘মাথা’ ও ‘রুটি’ প্রতীকের সমন্বয়ে ‘খাওয়া’ ক্রিয়া পদ বোঝানো হয়।

সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় কিছু কিছু ভাষা হারিয়ে যেতে বসেছে। বিশেষ করে যেসব ভাষার লিখিত রূপ নেই, সেগুলোর লিখিত রূপ দেয়ার জন্য এখনকার দিনে ভাষাতত্ত্ববিদরা ব্লুপ্রিন্ট কপি মেথড অনুসরণ করেন। এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান বর্ণমালাকে পরিবর্তন করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সিলেবারির। যেমন মিশনারি ভাষাতত্ত্ববিদরা নিউগিনি ও রেড ইন্ডিয়ানদের ভাষা সংরক্ষণের জন্য রোমান হরফ পরিবর্তন করেন। ১৯২৮ সালে তুরস্কে রোমান হরফের ভিত্তিতে তুর্কি ভাষার বর্ণমালা নকশা করেন দেশটির সরকারি ভাষাতত্ত্ববিদরা। একইভাবে রাশিয়ার অনেক আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণের জন্য সিরিলিক বর্ণমালার সহায়তা নেয়া হয়।

সভ্যতার বিবর্তনে তথ্য সংরক্ষণে ভাষার গুরুত্ব বিশেষ। আর এ কাজে জড়িয়ে রয়েছে কিছু ব্যক্তিবিশেষের নাম। সিরিলিক বর্ণমালা উদ্ভাবনে ভূমিকা রেখেছেন সেন্ট সিরিল। এ গ্রিক মিশনারি নবম শতকে গ্রিক ও হিব্রু বর্ণমালার সমন্বয়ে এটি নকশা করেন। এমনই আরেকজন বিশপ উলফিলাস। চতুর্থ শতকে তিনি জার্মান ভাষা গোত্রের বর্ণমালা তৈরি করেন। ইংরেজি ভাষাও এ গোত্র থেকেই উদ্ভূত। এর বর্ণমালার ২০টি গ্রিক, পাঁচটি রোমান ও দুটি অন্য উৎস থেকে নেয়া। ব্লুপ্রিন্ট কপি পদ্ধতির দীর্ঘদিনের পথচলার ফসল স্বয়ং রোমান বর্ণমালা।

বর্ণমালার সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় সেমিটিক ভাষার ইতিহাসে। চার হাজার বছর আগে যার বিস্তার ছিল সিরিয়া থেকে সিনাই পর্যন্ত। পরবর্তীতে পৃথিবীতে যত বর্ণমালার নমুনা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই সেমিটিক বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিকের উদ্ভব হয় ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিসরে।

লিখিত ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি এলাকা ইস্টার দ্বীপ, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসেও এক বিস্ময়। সেখানে বসবাসকারী পলিনেশীয়দের নিজস্ব লিখনশৈলী ছিল। সেখানে সংরক্ষিত নমুনা পাওয়া যায় ১৮৫১ সালে। ইউরোপীয়রা সেখানে পৌঁছার আগেই স্বতন্ত্র লিখন পদ্ধতি খুঁজে নেয় বাসিন্দারা।

চীনে লেখার কৌশল উদ্ভব হয় ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তারও আগে। এ ভাষার নিজস্ব প্রতীকের সংখ্যা অনেক। রয়েছে একেবারেই অভূতপূর্ব কিছু নীতিমালা। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, চীনের বর্ণমালা সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিকে উদ্ভূত। কেননা লেখার কৌশল আবিষ্কার হয় ৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। চীনের মূল সভ্যতার কেন্দ্র থেকে সুমেরীয় সভ্যতার দূরত্ব চার হাজার মাইল ও সিন্ধু সভ্যতার দূরত্ব ২ হাজার ৬০০ মাইল। এ দূরত্বের মাঝে কোনো সভ্যতার লেখার কৌশল আবিষ্কারের কথা জানা যায় না। কাজেই অন্য কোনো উৎস থেকে চীনারা উৎসাহিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

# প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবন না উদ্ভাবনের পর উপযোগিতা

১৯০৮ সালের ৩ জুলাই। ক্রিট দ্বীপের প্রাচীন মিনোয়ান রাজপ্রাসাদে খনন চালাতে গিয়ে পুরাতত্ত্ববিদরা একটি চাকতি খুঁজে পান। প্রথম দিকে একে ছোট, সাধারণ-সরল, গোলাকার চাকতির বেশি কিছু মনে হয়নি তাদের। সাড়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের চাকতিটির দুই পাশে খোদাই করা ছিল কিছু চিহ্ন। চাকতির কিনার থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে এর কেন্দ্র বরাবর বাঁকানো পাঁচটি কয়েলের ভেতর খোদাই করা এ চিহ্নগুলোর সংখ্যা ২৪১। চিহ্নগুলোর মাঝখানে আবার উলম্ব আকারের কয়েকটি সরলরেখা টানা। সম্ভবত শব্দের বিভাজন বোঝানোর জন্য সরলরেখাগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের ধারণা, চাকতিটি বানানোর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ। পরে সবার কাছে এটা পরিচিতি পায় ফিয়াসটোস ডিস্ক নামে।

ডিস্কের প্রতিটি চিহ্ন একেকটি অক্ষরের প্রতীক এবং অক্ষর ও লেখ্যরীতি উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতায় তা সংরক্ষণ চেষ্টার নিদর্শন হলো চাকতিটি। এটিতে খোদাই করা অক্ষরগুলো হাতে লেখা হয়নি, বরং অনেকটা স্ট্যাম্পের মতো ব্লক থেকে ছাপ নিয়ে বসানো হয়েছে।

লেখার কৌশল উদ্ভাবনের পর থেকেই মানুষের তা ছাপানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়াসের নিদর্শন হলো ফিয়াসটোস ডিস্ক। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানে আরো কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৌশলটা ছিল ব্লকের ওপর কালি নিয়ে কাগজে ছাপানোর প্রয়াস। লেখা ছাপানোর এ প্রয়াস সফল হতে সময় নিয়েছে আরো সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশি সময়।

প্রযুক্তি তার প্রাথমিক উত্কর্ষের সময়টা পার করেছে যুদ্ধাস্ত্র বা সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে। সে সময় রাজ্যবিস্তারে বা নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনে ভূমিকা রাখে প্রযুক্তি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়। কেন এর বিকাশের ধারাটা আটকে গেছে ইউরেশিয়ায়? কেন আঠারো শতকের দিকেও নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের হাতে এমন সব পাথুরে অস্ত্র দেখা গেছে; ইউরেশিয়া ও আফ্রিকার মাটিতে যেগুলোর ব্যবহার শেষ হয়ে গেছে কয়েক হাজার বছর আগেই? কেন বৃহত্ কয়েকটি লোহা ও তামার মজুদসমৃদ্ধ খনি থাকা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের মানুষ পড়েছিল সেই প্রস্তর যুগে?

নিউরোবায়োলজি বলে, অঞ্চলভেদে মানুষের মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিমত্তার রকমফেরে কোনো হেরফেরের সুযোগ নেই। তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ইউরেশীয়দের তুলনায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির লোকজন পিছিয়ে পড়ল কেন? রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বা এডিসন বা গুটেনবার্গের মতো মেধাবীরাইবা কেন পাপুয়া নিউগিনির মতো অঞ্চলগুলোয় জন্মাননি?

এর একটি কারণ হতে পারে সমাজের নতুন কিছু গ্রহণের মনমানসিকতা। কিছু কিছু সমাজে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি এমনভাবে জেঁকে থাকে যে, পরিবর্তনের সামান্য আভাসেই ভীত হয়ে ওঠে তারা। ব্যক্তিগতভাবে এসব সমাজের মানুষজন অনেক বুদ্ধিমান হলেও সামাজিক পরিপক্বতার অভাবে আটকে পড়ে পুরো জনগোষ্ঠী। এ কারণেই তোরেস স্ট্রেইটের (অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়ার মাঝামাঝি প্রণালি) অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীর-ধনুকের ব্যবহার থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আদিবাসীদের মধ্যে এর প্রচলন হয়নি কখনো। অথচ এদের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল না, বিষয়টা এমনো নয়। নতুন কোনো কিছুকে অস্বীকারের এ প্রবণতাই কি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটির পুরো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ? হ্যাঁ, তা হতে পারে।

একটা কথা আছে, ‘প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জননী’। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার ধারাবাহিকতায় সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের বিষয়টা জড়িত। কিন্তু কথাটা আবার পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে।

চলমান প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে গিয়ে জন্ম নেয় নতুন প্রযুক্তি। আবার নেহাত উদ্ভাবকের খেয়াল, ঝোঁক বা আগ্রহের বশে, এমনকি দুর্ঘটনাবশত অন্য কোনো কিছু তৈরি করতে গিয়ে উদ্ভাবকের ভুলবশতও নতুন প্রযুক্তি জন্ম নিতে পারে।

প্রয়োজনই যে উদ্ভাবনের জননী, এ কথার সপক্ষে নিদর্শন পাওয়া যায় হাতেগোনা। কিন্তু এমন অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে, যেগুলোর প্রয়োজন বা ব্যবহারের জায়গা রীতিমতো খুঁজে বের করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয়টা দাঁড়িয়েছে উল্টো—‘উদ্ভাবনই প্রয়োজনের জননী।’

এডিসনের ফোনোগ্রাফ, নিকোলাস অটোর মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও বিষয়টা আসলে তা-ই ঘটেছে। এডিসন তার উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্র ফোনোগ্রাফের ব্যবহার খুঁজতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘এতে মৃত মানুষের শেষ কথা রেকর্ড করে রাখা যেতে পারে, অন্ধকে শোনানোর জন্য বই পড়ে রেকর্ড করে রাখা যেতে পারে, শব্দের বানান রেকর্ড করে রাখা যেতে পারে ...’

কিন্তু এতে যে গান রেকর্ড করে বারবার শোনা যেতে পারে, সেটা তার মাথায় আসেনি কখনো। একসময় তিনি তার সহকর্মীদের বলেছিলেন, তার এ উদ্ভাবনের আসলে কোনো বাজারমূল্য নেই। কিন্তু যখনই বাজারে তার যন্ত্র ব্যবহার করে পয়সার বিনিময়ে গান শোনানোর ব্যবসা শুরু হলো, বেশ ক্ষেপেই গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, এটা তার যন্ত্রের অপব্যবহার। পরে অবশ্য এতে বাণিজ্যিকভাবে গান রেকর্ডের বিষয়টা মেনে নিয়েছিলেন। তবে তাতেও সময় লেগেছিল ২০ বছর।

নিকোলাস অটোর মোটরগাড়ির ইঞ্জিন তৈরির বিষয়টাও তা-ই। ভূমিতে পরিবহনের কাজে ঘোড়া ব্যবহার করে এসেছে মানুষ। এ নিয়ে সন্তুষ্টিও ছিল পুরোপুরি। আর দূরপাল্লার পরিবহনের জন্য তো তত দিনে শুরু হয়ে গেছে রেলগাড়ির ব্যবহার। সুতরাং ১৮৬৬ সালে অটো যখন প্রথম গ্যাসচালিত ইঞ্জিন বানালেন, ঠিক কোন কাজে দুর্বল, ভারী ও সাত ফুট ওজনের ইঞ্জিনখানা ব্যবহার করা যায়, সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। ১৮৮৫ সালে এতে বেশকিছু পরিবর্তন এনে ডেইমলার ইঞ্জিনটি বসালেন নিজের সাইকেলের ওপর। তৈরি হলো প্রথম মোটরসাইকেল। ট্রাক তথা প্রথম মোটরগাড়ি তৈরিতে এর ব্যবহার করতে ডেইমলারকে অপেক্ষা করতে হয় আরো ১১ বছর, ১৮৯৬ পর্যন্ত। প্রথম ক্যামেরা, টেলিভিশন বা টাইপরাইটারকেও একই রকমভাবে উপযোগিতা খুঁজে পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক দিন পর্যন্ত।

আবার এমনো হয়েছে, উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও উদ্ভাবনের পর নতুন যন্ত্রের উপযোগিতা হয়েছে ভিন্ন। কয়লা খনি থেকে জল নিষ্কাশনের জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরির সময় ওয়াট নিজেও জানতেন না, তার যন্ত্র নিজের আসল জায়গা খুঁজে নেবে শিল্প-কারখানায় ও পরিবহনে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিভাবান উদ্ভাবকরা প্রতিদিন উদ্ভাবন করে চলেছেন এ রকম হাজারো নতুন যন্ত্র কিংবা উন্নত করে চলেছেন পুরনো প্রযুক্তিকে। কিন্তু তার মধ্যে টিকে থাকতে পারছে খুব কমই। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর নতুন উদ্ভাবনের পেটেন্ট করা হয় ৭০ হাজার। তার মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকার সুযোগ পায় হাতেগোনা কয়েকটি। বাকিগুলো মিলিয়ে যায় বিস্মরণের আঁধারে।

এসব উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যেমন প্রয়োজনকে একতরফাভাবে দেয়া যায় না, তেমনি ওয়াট কিংবা এডিসনদের মতো উদ্ভাবকদেরও মেধা নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছ্বাসেরও জায়গা নেই। প্রতিটি উদ্ভাবনই আসলে চলমান প্রযুক্তির উন্নয়ন বা পরিবর্তনের ফল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কৃতিত্ব আসলে ওয়াটের একার নয়। এ নিয়ে তারও আগে কাজ করেছেন নিউকোমেন। ওয়াটের ৫৭ বছর আগেই তিনি বানিয়েছিলেন আরেকটু কম উন্নত ধরনের বাষ্পীয় ইঞ্জিন। ওয়াট তাতে কিছু পরিবর্তন এনে এর ব্যবহারযোগ্যতা বাড়িয়েছিলেন মাত্র। নিউকোমেনের আগে ব্রিটিশ উদ্ভাবক টমাস স্যাভারি, তার আগে ফরাসি ডেনিস পেপিন, তারও আগে ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হিউজেনস ও তার সহকর্মীরা এ নিয়ে কাজ করেছিলেন। আর তাদের সবার কাজের ভিত্তি ছিল পূর্বসূরিদের গবেষণা ও দাঁড় করানো প্রযুক্তি। সুতরাং চায়ের কেটলি থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখে ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন বানানোর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, এটি বিজ্ঞানের নামে গল্পগাথা চালুর প্রয়াস মাত্র। ওয়াট তথা সব বিজ্ঞানীর কাজের মূল অনুপ্রেরণা ও ভিত্তি হলো পূর্বসূরিদের কাজ ও গবেষণা।

সুতরাং পুরো আলোচনার ভিত্তিতে দুটো সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত. প্রযুক্তিগত উত্কর্ষ বা নতুন উদ্ভাবন আসলে অনেকের মিলিত প্রয়াসের ফসল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সিদ্ধান্ত ও অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং চলমান প্রযুক্তির ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবন হয় নতুন যন্ত্র বা আসে প্রাযুক্তিক উত্কর্ষ।

দ্বিতীয়ত. অধিকাংশ উদ্ভাবন প্রয়োজনের ভিত্তিতে আসেনি, বরং উদ্ভাবনের পর তাদের খুঁজে নিতে হয়েছে নিজস্ব উপযোগিতা; যার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে অলিখিত প্রাচীন যুগের প্রাযুক্তিক বিকাশের ধারায়ও।

# উদ্ভাবনে যুদ্ধ রেখেছে ধারাবাহিক অবদান

নতুন যন্ত্র উদ্ভাবনেই কেবল শেষ হয়ে যায় না একজন বিজ্ঞানী বা উদ্ভাবকের কাজ। সমাজকে উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা বোঝানোটাও জরুরি এক্ষেত্রে। অনেক সময় অগ্রসর সমাজ ব্যবস্থায়ও নতুন উদ্ভাবন গ্রহণযোগ্যতা পায় না। এখন পর্যন্ত এমন অনেক গবেষণা থেকে অগ্রসর সমাজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যা হয়তো বিদ্যমান প্রযুক্তির তুলনায় বেশ কার্যকর হতে পারত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন কংগ্রেসের ১৯৭১ সালে সুপারসনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পেছনে অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কিংবা যুক্তরাজ্যের সড়কগুলোর পাশে বৈদ্যুতিক বাতি বসানোয় অনাগ্রহের কথা।

অগ্রসর হোক বা অনগ্রসর, সমাজের কাছে নতুন প্রযুক্তি-আবিষ্কার গ্রহণযোগ্যতা পাবে কিনা, তা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর। প্রথমত. বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থায় তার ব্যবহার উপযোগিতা। এ কারণেই প্রাচীন মেক্সিকোর বাসিন্দারা এক্সেলসহ চাকা বানিয়েছিল ঠিকই, তবে তা নিছকই শিশুদের খেলনা হিসেবে। সেখানকার পরিবহন ব্যবস্থায় তার কোনো উপযোগিতা ছিল না। কারণ চাকা লাগানো গাড়ি টেনে নেয়ার উপযুক্ত কোনো পশু পোষ মানাতে পারেনি তারা।

দ্বিতীয়ত. নতুন কোনো কিছুর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদাও অনেকাংশে সম্পর্কিত। যখন এ ধরনের বিষয় চলে আসে, তখন উদ্ভাবিত কৌশল বা যন্ত্রটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন যতই সহজসাধ্য করে তুলুক না কেন, মানুষ তা গ্রহণে নারাজ হয়ে ওঠে। জাপানি কানজি লেখ্যরীতির তুলনায় সাধারণ কানা লেখ্যরীতি অনেক সহজ। কিন্তু কানজি রীতিতে লেখার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নটি যুক্ত থাকায় সাধারণ জাপানিদের কাছে এ রীতির গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

আবার বাজার অর্থনীতির যুগে কোনো কোনো অগ্রসর সমাজে প্রতিযোগিতার অভাবও প্রযুক্তি বিকাশের অন্তরায় হয়ে ওঠে। ট্রানজিস্টরের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু ট্রানজিস্টরভিত্তিক ইলেকট্রনিকসের বাজারে একচেটিয়া দখলদারিত্ব জাপানের এবং এ ধরনের পণ্য সরবরাহের জন্য মার্কিনদের নির্ভর করতে হয় জাপান থেকে আমদানির ওপর। কারণ জাপানের সনি ইলেকট্রনিকস যখন ট্রানজিস্টরের পেটেন্ট কিনে নেয়, আমেরিকায় তখন ভ্যাকুয়াম টিউবভিত্তিক ইলেকট্রনিক পণ্যের জয়জয়কার। সাধারণ মার্কিনরা এ প্রযুক্তিই গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে বাজারে চলমান নিজেদের পুরনো পণ্যের প্রতিযোগী নতুন কোনো পণ্য উন্মোচন করতে চায়নি ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক।

কিছু প্রযুক্তি আছে, যার কার্যকারিতা দৃশ্যমান না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা পায় না। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে তারিফার যুদ্ধের সময় স্পেনে উপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ডের আর্ল অব ডার্বি ও আর্ল অব স্যালিসবুরি। আরবদের সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডদের সেই যুদ্ধে তারা প্রথমবারের মতো চোখে দেখেন ময়দানে আগ্নেয়াস্ত্রের কার্যকারিতা। এর আগ পর্যন্ত ইউরোপের সবখানে তখনো শুরু হয়নি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার। যুক্তরাজ্যে ফিরে গিয়ে দুই আর্ল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে শুরু করলেন কামানের ব্যবহার। কিছুদিনের মধ্যে 'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' শুরু হলে তার বছর ছয়েক পর ১৩৪৬-এর ২৬ আগস্ট ক্রেসির যুদ্ধে ফরাসি বাহিনীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়ায় ভূমিকা রেখেছিল ব্রিটিশ কামান।

ঐতিহাসিকরা প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে মোট ১৪টি উপাদানের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে সমাজের গড় আয়ু। প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ ও দীর্ঘ সময় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে এর সুফল ভোগ করা পর্যন্ত বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদকে বেঁচে থাকতে হবে।

পরের পাঁচটি উপাদান অর্থনীতি বা সামাজিক সংগঠনসংশ্লিষ্ট। এগুলো হলো— সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা, পেটেন্ট ও সম্পত্তি আইন, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সুযোগ, গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

পরবর্তী চারটি উপাদান সম্পূর্ণ আদর্শিক। এগুলো হলো— ব্যক্তির ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

এ ১০ অনুমানের সবক'টিই সঠিক হতে পারে। তবে এর কোনোটিকেই সরাসরি ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে মেলানো সম্ভব নয়। শুধু পেটেন্ট আইন বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি যদি বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে সহায়ক হতো, তাহলে তা মধ্যযুগ-পরবর্তী সময়ে চীন বা ভারতে না ঘটে ইউরোপে ঘটল কেন?

তবে প্রযুক্তির বিকাশে এ ১০ উপাদান যে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে পরবর্তী চারটি উপাদানের মতো ধারাবাহিকতা আর কোনো উপাদানে কখনই দেখা যায়নি। এগুলো শুধু প্রযুক্তির বিকাশই ঘটায়নি, একে আত্মস্থও করে নিয়েছে পুরোপুরি। আবার বিপরীতে এ বিকাশের পথে এখন পর্যন্ত এদের মতো অন্তরায়ও হয়ে উঠতে পারেনি কোনো কিছু। বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিকাশ ও নিকাশের জন্য প্রভাবক ও দায়ী ঐতিহাসিক উপাদানগুলো হলো— যুদ্ধ, কেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থা, আবহাওয়া ও সম্পদের প্রাচুর্য।

এর মধ্যে পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে যুদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিমান ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে বদলে দিয়েছে পুরো পৃথিবীর পরিবহন ব্যবস্থাকে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব কিছু শাখা। তবে প্রযুক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টির কাজ যুদ্ধের মতো আর কোনো সামাজিক-ঐতিহাসিক উপাদানের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এর পর বলা যায় কেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থার কথা। উনিশ শতকের শেষ দিকে জার্মানি ও জাপানে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল শুধু এই একটি উপাদানের কারণে। আবার ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পর চীনের পিছিয়ে পড়ার জন্যও দায়ী দেশটির সে সময়কার কেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থা।

আরেকটি প্রভাবক উপাদান হলো আবহাওয়া ও পরিবেশ। অনেকেই মনে করেন, প্রযুক্তির বিকাশের জন্য আদর্শ আবহাওয়া বা পরিবেশ হলো এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে এর উন্নয়ন ঘটানো ছাড়া টিকে থাকাই অসম্ভব। যেখানে আবহাওয়া অনুকূল, সেখানে প্রযুক্তিগত বিকাশের মাধ্যমে টিকে থাকার কোনো চেষ্টা করে না মানুষ। মনোরম আবহাওয়া আর খাবারের প্রাচুর্য থাকলে আদিম মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের কোনো প্রয়োজনই পড়ত না; যা রুদ্ধ করে দিত বিকাশের সবক'টি পথ।

সমাজের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রভাবক সর্বশেষ উপাদানটি হলো সম্পদের প্রাচুর্য। বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত কম তর্ক হয়নি। মানবসভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে কোনটি? সম্পদের প্রাচুর্য, নাকি অভাব? সম্পদের প্রাচুর্য বেশি হলে তা ব্যবহারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও প্রাযুক্তিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব। যেমন— প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ওয়াটার মিল প্রযুক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছে উত্তর ইউরোপে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, তাহলে আরো বেশি বৃষ্টিপাতসমৃদ্ধ এলাকা নিউগিনিতে এর বিকাশ ঘটল না কেন? যুক্তরাজ্যের বননিধনের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যায়, দেশটি কয়লা শিল্পের প্রাথমিক যুগে শীর্ষস্থান কী করে দখল করে নিল। আবার এক্ষেত্রেও প্রশ্ন জাগে, চীনের বৃক্ষনিধন কেন দেশটির বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারল না?

নিত্যনতুন গবেষণা ও প্রাযুক্তিক বিকাশের গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা বিচারে সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া না গেলেও এর ধারা আলোচনায় সহায়ক হয়ে উঠতে পারে এ ১৪ উপাদান। তবে তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এগুলোকেই মুখ্য ধরে নিলে সম্ভাবনা আছে মূল বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত থেকে যাওয়ার।

এক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বকে অস্বীকারের উপায় নেই। একই সঙ্গে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে জ্ঞান আদান-প্রদানের জায়গাটাও গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস বলে, পৃথিবীর বাকি জনগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন ছিল তাসমানিয়ার জনগণ। পৃথিবীর বাকি জনগণের চেয়ে এরা বিচ্ছিন্ন থেকেছে প্রায় ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়। এর মধ্যে নিজেদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ছাড়া বাইরের পৃথিবীর আর কোনো কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি তারা। অস্ট্রেলীয়দের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছেছিল এশীয় প্রযুক্তির ছিটেফোঁটা মাত্র। এর কারণ ইন্দোনেশীয় দ্বীপমালার মাধ্যমে এশিয়া থেকে মহাদেশটির বিচ্ছিন্নতা। নতুন প্রযুক্তি বিকশিত হয় পুরনো প্রযুক্তির ধারাবাহিকতায়। কিন্তু প্রাথমিক প্রযুক্তির অভাব ও উন্নততর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাই এসব অঞ্চলের মানুষের পিছিয়ে থাকার বড় কারণ।

# বৈষম্যহীন সমাজ থেকে অভিজাততন্ত্র

নিউগিনির জলাভূমি অঞ্চলে স্থানীয় এক আদিবাসী গোষ্ঠীর দেখা পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরে প্রায় সভ্যতা বিবর্জিত এ জনগোষ্ঠীর নাম 'ফায়ু'। নিজেদের বাইরে তাদের অস্তিত্ব শুধু রণপীড়িত তাদের প্রতিবেশীরাই জানত। এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে তারা পরিচিত 'কিরিকিরি' নামে।

নিউগিনির আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে বাইরের মানুষের প্রথম সাক্ষাতের বিষয়টা চিত্তাকর্ষক। এদের সঙ্গে ডোগ নামে এক ইউরোপীয়র প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাটাও অনন্যসাধারণ। হেলিকপ্টারে চড়ে ডোগ গিয়েছিলেন এদের সঙ্গে খাতির করতে। তার সে অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর ছিল না।

ফায়ুরা সাধারণত গোত্রবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত নয়। নিউগিনির জলাভূমি অঞ্চলে প্রতিটি ফায়ু পরিবার বাস করে বিচ্ছিন্নভাবে। সাধারণত বিয়ে বা এ ধরনের বড় কোনো সামাজিক উৎসব ছাড়া বছরে এক-দুবারের বেশি তাদের কোনো জমায়েত দেখা যায় না। এ ধরনের জমায়েতে সর্বোচ্চ লোক দাঁড়াতে পারে টেনেটুনে বারোজন।

ভাগ্যক্রমে এ রকমই একটি জমায়েতে হাজির হয়েছিলেন ডোগ। সেখানে এক ফায়ু যুবক আবিষ্কার করে বসে তার বাবার খুনিকে। সঙ্গে সঙ্গে কুঠার উঁচিয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এগিয়ে যায় সে। তাকে আটকাতে গিয়ে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে উপস্থিত সবাই। এবার সুযোগ পেয়ে যায় তার বাবার খুনি। সেও যুবকের দিকে তেড়ে আসে কুঠার উঁচিয়ে। অবশেষে তাকেও মাটিতে ফেলে তখনকার মতো পরিস্থিতি শান্ত করে উপস্থিত ফায়ুরা।

ডোগের ভাষ্যমতে, ফায়ুদের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় অহরহ। কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায় এ ধরনের সমস্যা সমাধানের ভার তারা তুলে নেয় নিজেদের হাতেই। সব মিলিয়ে এ জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ৪০০। নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ী একসময় লোকসংখ্যা ছিল দুই হাজারেরও বেশি। কিন্তু নিজেদের ভেতরের সংঘর্ষে কমে এসেছে জনসংখ্যা।

বরফ যুগের শেষ দিকে পৃথিবীর তাবৎ জনগোষ্ঠীর অবস্থাটা ছিল ফায়ুদের মতোই। এমনকি তাদের সমাজ ব্যবস্থাও এর চেয়ে জটিল কিছু ছিল না। এমনকি সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যায়, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকেও মানুষ সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রসীমার বিভাজনের ভেতর নিয়ে আসতে পেরেছিল ২০ শতাংশেরও কম ভূখণ্ড। অন্যদিকে এন্টার্কটিকা ছাড়া বর্তমান পৃথিবীর পুরোটাই বিভাজিত হয়েছে কোনো না কোনো দেশের সীমানায়। প্রাগৈতিহাসিক কালের সরল ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী এসব সমাজ এখন পরিচালিত হয় জটিল সরকার ও নিয়মতান্ত্রিক ধর্ম ব্যবস্থার অনুশাসনে। ইস্পাত, বারুদ, মহামারী ও লেখ্যরীতির পাশাপাশি ধর্ম ও সরকার ব্যবস্থার এ যোগসাজশে নির্মাণ হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাস তথা মানবসভ্যতার ইতিহাস। ফায়ুদের আসলে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বেশি কিছু বলার উপায় নেই। সংখ্যাল্পতাই এর একমাত্র কারণ। এদের সমাজে কোনো রাষ্ট্রের উপস্থিতি নেই, নেই রক্ষীবাহিনী, নাগরিক জীবন, অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান কিংবা শ্রেণীবৈষম্যের উপস্থিতি। যেমনটি একসময় ছিল না প্রাচীন পৃথিবীর কোনো সমাজে।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে নতুন একটা প্রশ্নের জন্ম হতে পারে। সেটা হলো এদের প্রত্যেকের উদ্ভব কি একসঙ্গে, নাকি একের পর এক?

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর পর্যালোচনাপূর্বক এ উত্তর দেয়া সম্ভব। একই সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে সভ্যতার লিখিত ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোকে। নৃতাত্ত্বিকরা মানবসমাজের বিবর্তনের ধারাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বেশকিছু স্তরের বর্ণনা করেছেন। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত হয়েছে এ স্তরগুলো। তবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উত্তরণের সময়কে বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন দুই স্তরের অন্তর্বর্তী সময়কে সংজ্ঞায়িত করা। বিষয়টা অনেকটা ‘১৯ বছর বয়সী তরুণকে কী বলা উচিত, সদ্যবয়ঃপ্রাপ্ত তরুণ না পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ’ ধরনের।

এখানে ভাগাভাগির এত সূক্ষ্ম হিসাবে না গিয়ে আমরা সমাজ বিকাশের স্তরগুলোকে বিচার করব সরল চারটি ভাগে— স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রগোষ্ঠী (ব্যান্ড), গোত্র (ট্রাইব), নেতৃত্বমুখী সমাজ (চিফডোম) ও রাষ্ট্র (স্টেট)।

এর মধ্যে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বা ব্যান্ড হলো সমাজের ক্ষুদ্র রূপ। বিকাশের একেবারে শুরুর ধাপ। এ ধরনের দলবদ্ধতা তৈরি হয় রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এখনো নিউগিনি ও অ্যামাজনে এ ধরনের ক্ষুদ্রগোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখন এ ধরনের অনেক ক্ষুদ্রগোষ্ঠী নিজস্ব স্বকীয়তার বাইরে রাষ্ট্রভুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে পুরোপুরি। আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে থাকলেও তাদের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে আংশিক বা পুরোপুরি। আফ্রিকার পিগমি, বুশম্যান, অস্ট্রেলীয় আদিবাসী, এস্কিমো, আমেরিকা মহাদেশের টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর মতো কিছু হতদরিদ্র এলাকার লোকজনের ভেতর এ ধরনের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রগোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই স্থায়ী বসতি স্থাপনের চেয়ে শিকার-সংগ্রহবৃত্তিতেই জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এ কারণে এরা স্বভাবগতভাবে যাযাবর। প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে সমগ্র মানবজাতি এ ধরনের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বা ব্যান্ডে বিভক্ত ছিল। এমনকি ১১ হাজার বছর আগেও অধিকাংশ মানুষকে এ ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ফায়ুরা এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থার খুব উত্কৃষ্ট উদাহরণ।

এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোয় সম্পদের বন্টন ব্যবস্থায় কোনো প্রকার বৈষম্য দেখা যায় না। বন্টন ব্যবস্থায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গুটিকয়েক লোকের বদলে পুরো গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। বয়স বা লিঙ্গ ছাড়া এদের মধ্যে তেমন কোনো ভেদাভেদও দেখা যায় না। শ্রেণীভেদ না থাকায় এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয় 'বৈষম্যবিহীন' হিসেবে। এখানে নেতৃত্ব বা মর্যাদার ভিত্তি হলো ব্যক্তিত্ব, শক্তিমত্তা, বুদ্ধি ও রণদক্ষতা।

এর পর আসা যাক গোত্রবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায়। সমাজ বিকাশের স্তরে দ্বিতীয় ধাপ ধরা যায় উপজাতি বা ট্রাইবগুলোকে। এ ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ সাধারণত ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বা ব্যান্ডের মতো যাযাবর জীবনযাপন করে না। তবে মৌসুম ভিত্তিতে কিছু কিছু গোত্রকে কিছু সময়ের জন্য স্থানান্তর হতে দেখা যায়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বা সমজাতীয় অন্যান্য ব্যান্ডের সঙ্গে একীভূত হয়ে ব্যান্ডগুলো পরিণত হয় একেকটি উপজাতিতে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন সেভাবে বিকশিত না হলেও তার ছাপ দেখা যায়। প্রতিটি উপজাতির স্বকীয়তা বিচার করা হয় তার নিজস্ব ভাষা বা সংস্কৃতির ভিত্তিতে। প্রায় ১৩ হাজার বছর আগে ফার্টাইল ক্রিসেন্টসহ বেশকিছু এলাকায় উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা হয় মূলত কৃষিভিত্তিক।

এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায়ও শ্রেণী সংগঠনের অনুপস্থিতি দেখা যায়। এ কারণে এদেরও বৈষম্যবিহীন বলাটা ভুল হবে না। এছাড়া এ ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ লোকজনের মধ্যেও কোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিকতা দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এদের মধ্যে পুলিশ বা কর ব্যবস্থা দেখতে পাওয়ার চিন্তা করাটাও বাতুলতা মাত্র। অর্থনৈতিক বিশেষায়ণ এ ধরনের সমাজে দেখতে পাওয়া যায়, তবে তা যৎসামান্য। গোষ্ঠীর প্রাপ্তবয়স্ক সবাই উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় কোনো না কোনোভাবে অংশ নেয়। এদের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা পরিবারগুলোর মধ্যে বিনিময় প্রথার ভিত্তিতে।

উপজাতীয় ব্যবস্থায় লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে একসময় পুরনো অর্থনৈতিক বন্টন ও সামাজিক অনুশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। তখন ধীরে ধীরে কর্তৃত্বমুখী হয়ে পড়ে সমাজ। বিশেষায়িত বন্টন ব্যবস্থা এবং সামাজিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদ ও কর্তৃত্ব হয়ে পড়ে বিশেষ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত। সমাজে দেখা দেয় শ্রেণীবিন্যাস ও বৈষম্য। একেই বলা হচ্ছে কর্তৃত্বমুখী সমাজ ব্যবস্থা বা চিফডোম। এর উদ্ভব হয় আনুমানিক সাড়ে সাত হাজার বছর আগে। এখানে সমাজের প্রধান ব্যক্তির হাতে চলে আসে পুরো ক্ষমতা; যা হস্তান্তর হতে থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে। সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি ধর্মীয় কর্তৃত্বেও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে তার একচ্ছত্র আধিপত্য।

এছাড়া সমাজের অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজ অনন্যতা বোঝানোর খাতিরে এদের মধ্যে দেখা দেয় বিলাসী জীবনযাপনের প্রবণতা। প্রধান পরিবারগুলোর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে বিশেষ শৌখিন দ্রব্যের ব্যবহার; যা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় বিশেষায়িত কারিগরদের, যারা শুধু এ অভিজাতদেরই সেবা করার জন্য নির্দিষ্ট। এদেরও ভরণ-পোষণের ভার গিয়ে পড়ে জনসাধারণের ওপর।

সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীর ওপর ভার পড়ে প্রধান ব্যক্তি, তার পরিবার, বিভিন্ন গোত্রপতি ও তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের। এশিয়া ও ইউরোপের বাইরে আমেরিকার নুটকা, কোয়াকিটেল ও টিলংগিট উপজাতিদের মধ্যেও এ ধরনের কর্তৃত্বমুখী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

বিকাশের স্তরের সর্বশেষ ধাপ হলো রাষ্ট্র। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় এন্টার্কটিকা বাদে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর প্রায় পুরো ভূখণ্ডই এখন চলে এসেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০০ সালের দিকে মেসোপটেমিয়া, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মেসো আমেরিকা, দুই হাজার বছর আগে আন্দেজ, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং এক হাজার বছর আগে পশ্চিম আফ্রিকায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে চিফডোম থেকে রাষ্ট্রে রূপান্তর

হওয়ার অসংখ্য নমুনা আমাদের সামনে উপস্থিত। এ কারণেই পুরনো চিফডোম, গোত্র ব্যবস্থা ও ব্যান্ডের তুলনায় পুরনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার পরিধিটাও বেশি।

মানবসমাজের বিকাশের ধারায় ফায়ু সমাজ ও আধুনিক রাষ্ট্রের অবস্থান একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে। আধুনিক আমেরিকানদের সঙ্গে ফায়ুদের পার্থক্য তৈরি করে দিচ্ছে পেশাদারি পুলিশ ব্যবস্থা, নগরায়ণ, অর্থ, বৈষম্য এবং অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপত্তির ক্রমধারা খুঁজে বের করতে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হবে সমাজবিদ্যা, পুরনো সভ্যতাগুলোর লিখিত ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির ওপর।

# বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়

সমাজ বিকাশের ধারায় কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বমুখী সমাজ বা চিফডোমে এসে জন্ম নেয় বৈষম্য। সমাজের নির্বাহী ব্যবস্থা যাদের হাতে তুলে দেয়া হয়, তারা জনগণের সম্পদ আত্মসাত্ করে তুলে দিতে থাকে অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে। এ অভিজাতদের হাতেই কুক্ষিগত হয়ে পড়ে সামাজিক ক্ষমতা। তাদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় ক্লেপটোক্রেসি বা সমাজের দুর্নীতিপরায়ণ নির্বাহী ব্যবস্থা।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ, সেটা চিফডোম হোক বা রাষ্ট্র, একটি সাধারণ প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটি হলো, জনগণ কেন তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পত্তি অন্যের কুক্ষিগত করে নেয়াটা বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়? কেন বিদ্রোহের আগুনে ছারখার হয়ে পড়ে না এসব অভিজাত শ্রেণী? পেছনে জনগণের আন্তরিক সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বহাল থাকে এ আমলাদের শাসন ব্যবস্থা? কেন ক্ষমতার পালাবদল আটকে থাকে তাদের নিজেদের ভেতরে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন প্লেটো থেকে মার্ক্স পর্যন্ত সব রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা। এমনকি আধুনিক কালের ভোটারদের ভেতরও এ ধরনের প্রশ্ন উঠছে অহরহ। যুগে যুগে সমাজের এসব আমলা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন চারটি মূল সূত্রের ওপর।

- সাধারণ জনগণকে নিরস্ত্র রেখে অভিজাত শ্রেণীকে সশস্ত্র করা। বর্তমানে অত্যাধুনিক অস্ত্রের বদৌলতে তা হয়ে উঠেছে অনেক সহজ। শিল্পায়িত কারখানার মাধ্যমে এসব অস্ত্র তৈরির ওপর নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে অভিজাত শ্রেণী।

- লুটপাট করা সম্পদের ছিটেফোঁটা ভাগ দিয়ে জনগণের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াস।

- শাসন ব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সহিংসতা দমন।

- রাজনৈতিক আদর্শ বা ধর্মীয় মতবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক দুর্বৃত্তপরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজ বিকাশের স্তরে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থায়ও অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস ও আচারের অস্তিত্ব ছিল। তবে তাতে কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বপরায়ণতা, অন্যায়ভাবে সম্পদের মালিকানা বদল এবং শান্তিরক্ষার মতো বিষয়গুলো ছিল অনুপস্থিত। এ অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ধর্মের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত সমাজ বা শাসন ব্যবস্থায় রাজা কিংবা সমাজের প্রধান হয়ে ওঠেন ঐশ্বরিক শাসন ব্যবস্থার পার্থিব প্রকাশ।

প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একীভূত হয়ে ওঠায় দুটো সুবিধা পাওয়া গেল।

প্রথমত. রক্ত বা আত্মীয়তা বন্ধনের বাইরে সমাজে পরস্পর অপরিচিতদের মধ্যে নতুন একটি বন্ধনের সুযোগ তৈরি হলো। একই বিশ্বাস ও রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী দুজন অপরিচিতের সামনে নিজেদের ভেতর বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার কারণ প্রতিষ্ঠা হলো।

দ্বিতীয়ত. সমাজস্থিত মানুষের সামনে বিনা প্রশ্নে নিজেদের জীবন উত্সর্গ করার মতো উপযুক্ত কারণ প্রতিষ্ঠা করা গেল। রক্ত বা আত্মীয়তার বাইরে নতুন এ বন্ধন সবার কাছে কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা হলো। তারা কোন দিক থেকে অন্যান্য সমাজের মানুষের তুলনায় আলাদা এবং কেন তাদের কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকা উচিত। একই সঙ্গে নিজ সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে কেন ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বিসর্জন দেবে, সে প্রশ্নেরও জবাব তৈরি হলো।

বর্তমান যুগে আমরা যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই, তার সবই রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশের শুরুর দিকে রাষ্ট্রের তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেনাবাহিনীর ওপর নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা বা সমমর্যাদার রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ নেতা (ডেসপোট)। এমনকি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে গুটি কয়েক লোকের। এ বিষয়ে যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র তাদেরই।

কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক স্তরের শাসন ব্যবস্থার তুলনায় জনগণের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। এমনকি অর্থনৈতিক বন্টন কাঠামোও থাকে অনেক দৃঢ়। এ বন্টন ব্যবস্থা এতটাই বিশেষায়িত করা হয়েছে, এখনকার দিনে কৃষকরাও কৃষিক্ষেত্রে কোনোভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। কৃষি উত্পাদনের উপকরণ থেকে শুরু করে সবকিছুর জন্যই তাদের নির্ভর করতে হয় অন্যের ওপর। এ কারণেই কোনোভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধসে পড়লে জনগণের ওপর তার প্রভাব পড়ে মারাত্মক।

এ কারণেই ৪০৭ থেকে ৪১১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন থেকে রোমান সৈন্য, কর্মকর্তা ও অর্থ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের পর সৃষ্টি হয়েছিল নৈরাজ্যের। এমনকি প্রাচীন মেসোপটেমীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থা ছিল অনেক কেন্দ্রীভূত। পুরো সমাজের খাদ্যসংস্থানের দায়িত্ব ছিল চার পেশার মানুষের ওপর। চাষীদের কাজ ছিল শস্য উত্পাদন, পশুপালক গোষ্ঠী সরবরাহ করত দুধ ও মাংস, জেলেরা নদী থেকে মাছ এবং বাগান থেকে ফল ও সবজির জোগান দিত আরেক শ্রেণীর লোক।

এদের উত্পাদন উপকরণের পাশাপাশি অন্যান্য পেশার লোকদের আহরিত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করত রাষ্ট্র। শস্য উত্পাদক চাষীদের প্রয়োজনীয় বীজ থেকে শুরু করে হালের বলদ সরবরাহ করত রাষ্ট্র। আবার পশুপালকদের কাছ থেকে ভেড়ার লোম সংগ্রহ করে দূর দেশ থেকে তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ধাতু ও অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা হতো। আর কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা সরবরাহ করা হতো সেচ ব্যবস্থা সংরক্ষণে নিয়োজিত লোকদের কাছে।

কর্তৃত্বমুখী প্রাথমিক সমাজের (চিফডোম) তুলনায় প্রথম দিকের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আরো ভয়াবহ আকারে দেখা দেয় দাস প্রথা। চিফডোমগুলো যে রাষ্ট্রের তুলনায় পরাজিত শত্রুর প্রতি অনেক বেশি সদয় ছিল, বিষয়টা তাও নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দাস প্রথা এত ব্যাপক হয়ে ওঠার কারণ ছিল বিশেষায়িত অর্থনীতি ও বন্টন ব্যবস্থা। উত্পাদন ব্যবস্থায় আরো অনেক বেশি শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

চিফডোমের একস্তর বা দ্বিস্তরবিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রে এসে হয়ে পড়ে বহুস্তরবিশিষ্ট। অর্থনীতির মতো শাসনযন্ত্রও হয়ে পড়ে বিশেষায়িত। প্রচুর বিভাগ ও উপবিভাগসহ দেখা দেয় বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়। রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের প্রচেষ্টাগুলো আনুষ্ঠানিকতা পায় আইন, বিচার ও পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে।

প্রথম দিককার রাষ্ট্রগুলোতেও দেখা গেছে রাষ্ট্রধর্মের উপস্থিতি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এখানে গড়ে উঠেছে প্রধান প্রধান মন্দির। রাজাকে সেখানে গণ্য করা হতো দৈব প্রতিনিধি হিসেবে। এর নিদর্শন হিসেবে বলা যায় প্রাচীন মিসরীয়, ইনকা ও অ্যাজটেক সভ্যতার কথা। এখানে কেউ কেউ হয়ে উঠতেন দেবতার পুত্র, আবার কেউ স্বয়ং দেবতার অবতার। জাপানিরা রীতিমতো সম্রাটকে সম্বোধন করার জন্য 'আপনি'র সমার্থক নতুন একটি সর্বনামই তৈরি করে ফেলেছিল। এভাবে সম্বোধিত হওয়ার অধিকার ছিল একমাত্র সম্রাটেরই। প্রাচীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা নিজে স্বয়ং কখনো কখনো হয়ে উঠতেন সর্বোচ্চ ধর্মীয় পুরোহিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজের কাঁধে সে ভার না নিয়ে তারা প্রধান পুরোহিত নিয়োগ করতেন। মোটকথা, ধর্মীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হতো রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে। আবার কখনো কখনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থায় সরাসরি অংশ নিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় মন্দির শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল না। অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা ও তার নথিভুক্তকরণ এবং রাষ্ট্রীয় হস্তশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল মন্দির।

যে বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা ব্যান্ড থেকে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে আলাদা করেছে, তাদের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এসে। রাষ্ট্রের সঙ্গে গোত্র বা চিফডোমগুলোর মূল পার্থক্য হলো, রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমানার ভেতর। ব্যান্ড, গোত্র বা সরল চিফডোমগুলোর মতো পুরোপুরি রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না রাষ্ট্রযন্ত্র।

সমাজ বিকাশের ধারায় এসে আরেকটি অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছে রাষ্ট্র। সেটা হলো বহুজাতিক কিংবা বহুভাষী লোকদের এক সুতোয় নিয়ে আসার ক্ষমতা। গোত্র বা চিফডোমগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এদের অন্তর্ভুক্ত লোকজন সবাই একই জাতির অন্তর্গত এবং একই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা ও ভাষার অধিকারী।

গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থা ও চিফডোমগুলোয় আধিকারিক বা সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়োগে সাধারণত রক্তের সম্পর্কের একটা বড় ভূমিকা থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আমলা বা কর্তাব্যক্তিরা সাধারণত হয়ে থাকেন পেশাদার ও প্রশিক্ষিত নির্বাহী। পুরনো দিনগুলোয় রাষ্ট্রের প্রধান নিয়োজিত হতেন উত্তরাধিকার সূত্রে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ প্রথা লোপ পেয়েছে অনেকাংশেই।

# সমাজ বিবর্তনে জনসংখ্যা ও খাদ্য বন্টনের ভূমিকা

১৩ হাজার বছর ধরে মানবেতিহাসের ধারায় একটি সাধারণ প্রবণতা হলো, সমাজ গঠনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রতিষ্ঠানগুলো একে একে উচ্ছেদ করেছে সরল প্রতিষ্ঠানগুলোকে। তার মানে এই নয়, সমাজের জটিল গঠনই সবসময় জয়ী হবে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সরলতর কাঠামোর সমাজপ্রতিভূরা অনেক সময় বিধ্বস্ত করেছে জটিলতর কাঠামোর সমাজকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মঙ্গল চিফডোমের হাতে জটিলভাবে বিন্যস্ত চৈনিক রাষ্ট্র কাঠামো বিধ্বস্ত হওয়ার কথা। একইভাবে বর্বর জার্মান উপজাতি বা গোত্রগুলোর সমন্বিত চিফডোম পরাস্ত করেছিল রোমান সাম্রাজ্য।

সাধারণত রাষ্ট্র যখন ক্ষুদ্রতর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তার সাফল্যের সাধারণ সূত্র হলো উন্নততর সমরাস্ত্র ও প্রযুক্তি এবং উসকে দেয়া ধর্মীয় বা অন্য যেকোনো জাতীয়তাবাদী ভাবধারা, যার জন্য তার পক্ষের লোকজন চোখ বুজে প্রাণ দেবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে এ ধর্মীয় বা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আমাদের মস্তিষ্কে রীতিমতো প্রোগ্রাম করা হয় নানামুখী কলাকৌশলের মাধ্যমে; যার জন্য ব্যবহার করা হয় বিদ্যায়তন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে। আর এসব চিন্তাধারা আমাদের মাথায় এমনভাবে গেঁথে দেয়া হয় যে, আমরা ভুলে যাই ইতিহাসের গতিধারার সামনে এ ধরনের চিন্তাধারা কতটা অস্বাভাবিক। এ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসে প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী কিছু স্লোগান তৈরি করে। এ স্লোগানগুলো নিজস্ব ও সামাজিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে তা স্থাপন করে নাগরিকদের মস্তিষ্কে। এমনকি এর সুবিধার্থে প্রচলন ঘটানো হয় কিছু রীতিনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের। এ ধরনের স্লোগানের দু-একটি নমুনার কথা বলতে গেলে ব্রিটনদের 'ফর কিং অ্যান্ড কান্ট্রি' (রাজা ও রাজ্যের তরে) কিংবা স্প্যানিয়ার্ডদের 'পোর দিওস ওয়াই এসপানা'র (ঈশ্বর ও স্পেনের জন্য) কথা বলতে হয়। এমনকি অ্যাজটেকদের মধ্যেও এ ধরনের মানসিকতা প্রচলিত ছিল; যার প্রমাণ পাওয়া যায় এ গাথাকাব্যে, 'বীরগতিই (যুদ্ধে আত্মবলিদান) সর্বোত্তম। একমাত্র এভাবে মৃত্যুই হলো তার (অ্যাজটেকদের জাতীয় দেবতা হুইতজিলোপোতলি) চরণে পুষ্পার্ঘ্যের সমান; যার সম্ভাবনায় আমার অন্তরাত্মা নেচে ওঠে বারবার।'

ব্যান্ড ও গোত্রনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের চিন্তাধারা ধারণারও অতীত। নিউগিনিতে এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় গোত্রে গোত্রে যত লড়াইয়ের হদিস পাওয়া গেছে, তার কোনোটিতেই কোনো ধরনের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়াই কিংবা আত্মঘাতী হামলার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। এমনকি রণকৌশল তৈরির সময় নিজেদের পক্ষের হতাহত যতটা বেশি সম্ভব এড়ানোকেই প্রাধান্য দেয়া হয় সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু উন্নততর সমাজ কাঠামোয় উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিষয়টা সে রকম নয়। মৃত্যু নয়, বরং শত্রুকে ধ্বংস করতে গিয়ে প্রয়োজনে মৃত্যুবরণের মানসিকতাই এদের করে তোলে এতটা ভয়ঙ্কর। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কীভাবে রক্ত সম্পর্কভিত্তিক ছোট ছোট সমাজ পরিণত হলো বড় কেন্দ্রীভূত সমাজে, যেখানে অধিকাংশই একে অন্যের অনাত্মীয়?

ইতিহাসের নানা মোড়ে দেখা গেছে, এমন এমন জায়গায়ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে, যেখানে আশপাশে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা ও জনবিরল অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া এ ধরনের রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে বাকি সব মহাদেশেই।

প্রাচীন এসব রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল মেসোপটেমিয়া, উত্তর চীন, নীল ও সিন্ধু অববাহিকা, মেসো আমেরিকা, আন্দেজ ও পশ্চিম আফ্রিকায়। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে মাদাগাস্কার, হাওয়াই, তাহিতি ও পশ্চিম আফ্রিকায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে ইউরোপীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যদিকে একই রকমভাবে আশপাশ অঞ্চলের প্রভাবমুক্ত গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বা চিফডোমের উৎপত্তি ঘটেছে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অ্যামাজন, পলিনেশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে। এ সমাজগুলো বিশ্লেষণ করলে সামাজিক বিকাশের ধারা উপলব্ধি সহজ হয়ে আসে অনেকাংশে।

নানা মুনির নানা মত আছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে। অ্যারিস্টটল একে মানবসমাজের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখেছেন, যার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। তার এ ভ্রান্তির অবশ্য কারণ আছে। রাষ্ট্রের বাইরে সমাজের আর কোনো স্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি তিনি। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের দিকে অর্থাৎ তার সমসাময়িক কালে গ্রিক সভ্যতার প্রত্যেক সমাজ পরিণত হয়ে উঠেছে নগররাষ্ট্রে।

ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশোর চোখে রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো, এক ধরনের সামাজিক চুক্তি ও জনগণের নিজ স্বার্থে বাস্তবায়িত এক সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। অপেক্ষাকৃত সরল সমাজের তুলনায় রাষ্ট্র গঠনই তাদের জন্য বেশি কার্যকর। কিন্তু ইতিহাস বলে, রাষ্ট্র কখনই জনগণের স্বেচ্ছাকৃত বা দূরদর্শী চিন্তার ফসল হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সমাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককগুলো কখনই স্বেচ্ছায় নিজেদের অপেক্ষাকৃত বড় এককের মাঝে বিলীন করে দেয় না। একমাত্র বল প্রয়োগ বা বাইরের কোনো চাপের সম্মুখীন হলেই তারা এভাবে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় আরেকটি মত পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদও একে সমর্থন করেছেন। সেটা হলো, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে সেচ ব্যবস্থা। দেখা গেছে, যে সময় মেসোপটেমিয়া, উত্তর চীন ও মেক্সিকোয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে, সেই একই সময়ে এ অঞ্চলগুলোয় গড়ে উঠেছে বিশাল সেচ ব্যবস্থা; যা ঠিকঠাকমতো চালানোর জন্য বড় কেন্দ্রীভূত সামাজিক সংগঠন তৈরি করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র।

কিন্তু এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, তা সমাজ গঠনের শুধু সর্বশেষ স্তরকেই ব্যাখ্যা করে। অতীতের একেকটি স্তর থেকে আরেক স্তরে বিকাশের ধারা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই এতে। এমনকি প্রচুর ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণে সেচ ব্যবস্থাকেই রাষ্ট্রের জনক ঘোষণা করার মতো যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যায়নি। মেসো আমেরিকা ও আন্দেজের মায়া সভ্যতায় সেচ ব্যবস্থা বরাবরই গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র পরিসরে।

রাষ্ট্র গঠনে বড় ভূমিকা রাখার মতো একটি সামাজিক উপাদান হলো জনসংখ্যা। কোনো ব্যান্ড বা গোত্রের জনসংখ্যা যত বেড়েছে, তা ততটাই চাপ সৃষ্টি করেছে পুরনো সামাজিক গঠনের ওপর। বড় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠেছে জটিল থেকে জটিলতর।

জনসংখ্যা বেড়ে ওঠার পেছনে খাদ্য সরবরাহের প্রশ্নটি জড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে। এ কারণে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে খাদ্য সংগ্রহের প্রকৃতি। শিকারের প্রাচুর্যে কিছু শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠী নিজেদের উন্নীত করতে পেরেছিল চিফডোম পর্যন্ত। কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায়ে তারা পৌঁছতে পারেনি কখনই। কারণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য নাগরিকদের পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা থাকতে হয়; যা শুধু শিকার-সংগ্রহবৃত্তি দিয়ে মেটানো অসম্ভব। অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষির সংযুক্তীকরণ ও বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে সামাজিক সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে মোড় নেয় জটিল গঠনের দিকে।

এর বাইরেও খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সমাজের রূপরেখা গঠনে ভূমিকা রাখে তিনভাবে। প্রথমত. এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় শ্রমের মৌসুমভিত্তিক প্রয়োগ। ফসল কাটার মৌসুম শেষে সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামনে কাজে লাগানোর জন্য প্রচুর লোকের শ্রম সহজলভ্য হয়ে পড়ে। এ শ্রম তখন খাটানো সম্ভব হয় নিজেদের বল ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনের (যেমন মিসরের পিরামিড তৈরি) কাজে অথবা খাদ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিতের (সেচ ব্যবস্থা তৈরি ও উন্নয়ন) কাজে। এমনকি বেকার জনগণ সঙ্গে নিয়ে সৈন্য দল সৃষ্টি করে নতুন অঞ্চল বা এলাকা দখলের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে আরো প্রসারিত করার প্রয়াস নেয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত. খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব হয় উদ্বৃত্ত সৃষ্টি; যার ধারাবাহিকতায় আসে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষায়ণ ও বিভাজন। এ উদ্বৃত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনগুলোর বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে (নেতা, আমলা, অভিজাত, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি) লালন-পালন করা যায়।

তৃতীয়ত. খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতিই মানুষকে যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে এক স্থানে থিতু হয়ে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। ফলে মানুষ সুযোগ পায় প্রযুক্তি ও বিভিন্ন কলাকৌশল উদ্ভাবনের; যার ধারাবাহিকতায় আসে শ্রমবিভাজন ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগের নিত্যনতুন পদ্ধতির ফলে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন পেশা। সমাজের ও এর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংগঠন দিনে দিনে হয়ে ওঠে আরো জটিল।

এছাড়া সামাজিক গঠন জটিল করে তোলায় আরো ভূমিকা রাখে সমাজের অভ্যন্তরে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক। জনগণের ভেতরে সম্ভাব্য সংঘাত ও দ্বন্দ্ব নিরসন অথবা প্রতিরোধ করতে গিয়ে সামাজিক সংগঠনগুলোয় দেখা দেয় নানা জটিলতা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে পড়ে কঠিন। ফলে একসময় তা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থায় উদ্ভূত জটিলতা নিরসন ও ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা তৈরি করতে গিয়ে প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন স্থাপনের, যা বিকাশের ধারায় হয়ে ওঠে জটিল থেকে জটিলতর। এর মধ্যেই জন্ম নেয় সামাজিক আমলাতান্ত্রিকতার।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও একটি রাষ্ট্র বা গোত্রের আকার বাড়তে পারে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর একীভূতকরণের মাধ্যমে। জনগোষ্ঠীগুলো এ পদক্ষেপ নিতে পারে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার বা সাধারণ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। এছাড়া এক জনগোষ্ঠীর ওপর আরেক জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে তারা হয়ে উঠতে পারে একীভূত।

লেখ্য রীতি বা কৌশল, ইস্পাত, বারুদ ও মহামারীর পাশাপাশি বিজেতাদের দিগ্বিজয়ে ও বৈশ্বিক অর্থনীতির অসম বন্টনে ভূমিকা রেখেছে যুযুধান পক্ষগুলোর সামাজিক গঠন এবং এসব উপাদানের বিকাশ স্থান-কাল-পাত্র, এমনকি মহাদেশভেদেও হয়েছে ভিন্ন প্রকৃতির।

বিজয়ী পক্ষগুলোর জয় নির্ধারণে একেক ক্ষেত্রে উপাদানগুলোর সমন্বয় হয়েছে একেক রকম। আবার এমনও হয়েছে, এদের কোনো কোনোটির অনুপস্থিতিতেই গড়ে উঠেছে বিশাল সাম্রাজ্য। ইনকারা লিখতে জানত না। আবার অ্যাজটেকরা লিখতে জানলেও কোনো ধরনের মহামারীর সঙ্গে তাদের পরিচয় প্রায় ছিলই না বলা যায়।

# আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দের কঠিন জীবনযাত্রা

কোনো এক গ্রীষ্মে আমি ও আমার সহধর্মিণী ম্যারি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম। সেখানে মেনিনডি শহরের কাছে মরুভূমির বুকে এক পাহাড়ে আদিবাসীদের রক পেইন্টিং দেখতে যাই। মরুভূমির রুক্ষতা ও গ্রীষ্মের তীব্রতা সম্পর্কে আগেই জানতাম। ওই ভ্রমণের সময় তা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করি। ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমি ও নিউগিনির সাভানায় বিচরণের সুযোগ হয়েছিল। কাজেই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের শিল্পকর্ম দেখতে যাই পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েই। প্রচুর পানি সঙ্গে নিয়ে যাই। সময়টা ছিল দুপুর। মেঘমুক্ত আকাশে রোদের অকল্পনীয় তীব্রতা। আশপাশে ছায়াদায়ী কিছুই ছিল না। গরমের তীব্রতা ফিনিশ সনার (বাষ্পস্নান) কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমরা পাহাড়ের কিনারে পৌঁছার আগেই বয়ে আনা পানি শেষ হয়ে যায়। কেবল পানিই নয়, ফুরিয়ে যায় আমাদের চিত্রকর্ম দেখার সাধও। এমনকি এও বুঝলাম যে, জীবনে প্রথমবারের মতো আমার হ্যালুসিনেশন (বিভ্রম) হচ্ছে। দুজনেই মনস্থির করলাম— এখানে আর নয়। সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি পথ ধরলাম।

দুজনই কথা বলা ও শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কেবল গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ উপলব্ধি করি। অপেক্ষায় থাকি, কখন রাস্তা শেষ হবে। জিহ্বা ও গলা শুকিয়ে কাঠ। অবশেষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেঞ্জারে পৌঁছলাম। সেখানে ফ্রিজারে যে কয়েক বোতল ঠাণ্ডা পানি ছিল, চোখের পলক পড়ার আগেই তা পেটে চালান করে দিই। দুজনেরই শরীর ও মন ক্লান্ত-বিধ্বস্ত। একপর্যায়ে ওই আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দের কথা মনে পড়ে, যারা এ রকম তীব্র গরমের মধ্যেই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে; যেখানে তাপমাত্রার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, খাদ্য-পানীয় জোগাড় করাই ছিল বিশাল ঝামেলার।

সাদা চামড়ার অস্ট্রেলীয়দের কাছে বেজক্যাম্পের সুবাদে মেনিনডি খুব বিখ্যাত। আর ওই বেজক্যাম্পের সঙ্গে যে দুজনের নাম জড়িয়ে আছে, তারা হলেন আইরিশ পুলিশ কর্মকর্তা রবার্ট বার্ক ও ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম উইলস। তারাই প্রথম ইউরোপীয় অভিযাত্রী, যারা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তরে পাড়ি জমান। তবে তাদের যাত্রা পুরোপুরি সফল ছিল না। ছয়টি উটের পিঠে রসদ বোঝাই করে তারা অভিযান শুরু করেছিলেন। মেনিনডির মরুভূমিতে এসে তাদের রসদ ফুরিয়ে আসে। পর পর তিনবার তারা একই ধরনের সমস্যায় পড়েন এবং প্রতিবারই তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে আদিবাসীরা। মাছ, ফার্নকেক ও মোটাসোটা ইঁদুরের রোস্ট দিয়ে অভিযাত্রীদের আতিথেয়তা দেয়। কিন্তু বোকার মতো এক আদিবাসীকে গুলি করে বসেন বার্ক। ফলে বাকিরাও সাদা চামড়াদের ভয়ে পালিয়ে যায়। তবে রসদ না থাকায় বার্ক ও উইলসকে সঙ্গীদের নিয়ে মরুভূমিতেই প্রাণ হারাতে হয়। এক্ষেত্রে বন্দুকের মতো আধুনিক অস্ত্রও তাদের কাজে আসেনি।

মেনিনডিতে আমার ও ম্যারির অভিজ্ঞতা এবং বার্ক ও উইলের নিয়তি অস্ট্রেলিয়ায় সভ্যতার বিকাশে কঠিন চিত্রই তুলে ধরে। অন্য সব মহাদেশ থেকে আলাদা অস্ট্রেলিয়ার বৈশিষ্ট্য। এ মহাদেশ সবচেয়ে শুষ্ক, খটখটে, সমতল, অনুর্বর। এর আবহাওয়া সম্পর্কে আগেভাগে ধারণা পাওয়া যায় না। এ মহাদেশেই সবার পরে আসে ইউরোপীয়রা। তার আগে একেবারেই আলাদা সমাজ গড়ে ওঠে এবং হাতেগোনা অল্প কিছু মানুষেরই আবাস ছিল এ মহাদেশ। মানবসভ্যতায় বিভিন্ন সমাজের আন্তঃমহাদেশীয় পার্থক্য সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। এর পরিবেশ যেমন স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ, তেমনি এর সমাজও। রুক্ষ পরিবেশের কারণে সমাজের বিকাশ কঠিন ছিল, নাকি তার উল্টো?

একজন সাধারণ মানুষও জানেন, অন্য মহাদেশের বাসিন্দারা যখন যথেষ্ট সভ্য হয়ে উঠেছিল, তখনো অনেক পিছিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীরা। তারা সভ্যতার কোনো অনুষঙ্গই কাজে লাগায়নি। কৃষিকাজ, পশুপালন, ধাতুবিদ্যা, তীর-ধনুক ব্যবহার, ভবন নির্মাণ, সংগঠিত গ্রাম, লেখালিখি, সামাজিক সংগঠন কিংবা রাষ্ট্রের ধারণা— কোনো কিছুই শিখতে পারেনি। বরং যাযাবর, শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবেই দিনাতিপাত করে। ক্ষণস্থায়ী বসতিতে দল বেঁধে ছিল তাদের জীবনযাপন।

গত ১৩ হাজার বছরে সবচেয়ে কম পরিবর্তন ঘটেছে যে মহাদেশে, তা অস্ট্রেলিয়া। সেখানকার আদিবাসী সম্পর্কে ইউরোপীয়দের যে ধারণা, তা এক ফরাসি অভিযাত্রীর ভাষ্যে ফুটে ওঠে, ‘তারা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। তাদের পশুতুল্যও বলা চলে।’ তবে এদের কিছু অর্জনের কথা না বললেই নয়। তারা কিছু পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করতে শেখে। পাথরের ওপর চিত্রকর্মের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন অস্ট্রেলিয়ায়ই পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রসঙ্গ উঠলে নিউগিনির কথাও আসে। ইউরোপীয়দের অভিযানের আগে দুই ভূখণ্ডের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল প্রায় একই। ১৯ শতকে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপনের আগে নিউগিনির লোকেরাও ছিল নিরক্ষর। পাথরের অস্ত্রই ছিল তাদের মূল হাতিয়ার। সামাজিক সংগঠনও অতটা জোরালো ছিল না।

আদিবাসীদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়ে যদি জানতে চাওয়া হয়, অধিকাংশ সাদা অস্ট্রেলীয় বলবেন, ওরা নিজের কারণেই পিছিয়ে ছিল। চেহারার গঠন, ত্বকের রঙ— সবদিক দিয়েই ইউরোপ থেকে পাড়ি জমানো মানুষের চেয়ে আলাদা আদিবাসীরা। তাদের জীবনধারায় পরিবর্তনের কৃতিত্ব অন্য মহাদেশ থেকে পাড়ি জমানো মানুষেরই। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ ঔপনিবেশিকরাই নিরক্ষর, যাযাবর এ সম্প্রদায়কে বদলে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার পুরনো বাসিন্দারা পরিণত হয় খাদ্য উৎপাদনকারী ও শিল্পভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজে। এ কাজে মাত্র কয়েক দশক সময় লাগে। অথচ তার আগের ৪০ হাজার বছর ধরে নিছক শিকারি-সংগ্রাহক ছিল তারা। অবশ্য এ কৃতিত্ব কেবল ঔপনিবেশিকদেরই নয়। মহাদেশটিতে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের ভাণ্ডার এর শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। একইভাবে ছিল তামা, টিন, দস্তা ও সিসার প্রাচুর্য।

এত কিছুর বিশাল সংগ্রহের পরও আদিবাসীরা নিজেদের মতো করে সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। বিষয়টিকে মানবসভ্যতার বিবর্তনে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেয়া যায়। অন্য মহাদেশের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারও যথেষ্ট মিল ছিল। কিন্তু পার্থক্য ছিল শুরুর দিকে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সঙ্গে। সাগর পাড়ি দেয়া ইউরোপীয় ও আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা কিছুটা বর্ণবাদী মনে হতে পারে। বিষয়টি সহজ কথায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। তবে সবাই স্বীকার করেন, এখনকার অস্ট্রেলিয়া গড়ে ওঠার কৃতিত্ব সেখানকার বাসিন্দাদের হাতে নয়, বরং সাগর পাড়ি দেয়া ঔপনিবেশিকদের।

# ঔপনিবেশিকদের গড়া গ্রেটার অস্ট্রেলিয়া

৪০ হাজার বছর আগে থেকেই অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনিতে মানুষের বসবাস ছিল। ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের আগে অঞ্চল দুটি একসঙ্গেই ছিল। ওই সময় অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির অবস্থান ছিল খুবই কাছাকাছি; যা গ্রেটার অস্ট্রেলিয়া নামে পরিচিত। তত্‌কালীন মানচিত্র দেখে ধারণা করা হয়, সবচেয়ে নিকটবর্তী মহাদেশ থেকেই আদিবাসীরা এখানে পাড়ি জমায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেরা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ব্যবহার করে এখানে আসে। এ ধারণা হয় আদিবাসীদের বংশগতির ভিত্তিতে। আদিবাসী অস্ট্রেলীয়, নিউগিনি ও এশিয়ার আদি অধিবাসীদের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। আদিবাসীদের মধ্যে এখনো যাদের পূর্বপুরুষের ছাপ স্পষ্ট, তাদের সঙ্গে ফিলিপাইন, মালয় উপদ্বীপ ও মিয়ানমারের নিকটবর্তী আন্দামানের মানুষের সাদৃশ্য রয়েছে।

গ্রেটার অস্ট্রেলিয়ার সৈকতে পা রাখার পর অল্প দিনের মধ্যেই বিশাল ভূখণ্ডের সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রথম দিককার বসতি স্থাপনকারীরা। ৪০ হাজার বছর আগের জীবাশ্ম ও পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে মহাদেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ৩৫ হাজার বছর আগের নিদর্শন পাওয়া গেছে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও তাসমানিয়ায়। ধারণা করা হয়, আদি বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউগিনি হয়ে দেশটিতে প্রবেশ করে। সে হিসাবে তাদের প্রবেশমুখ থেকে সবচেয়ে দূরের রাজ্য তাসমানিয়া। এখন থেকে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে নিউগিনির হাইল্যান্ডেও বসতি গড়ে ওঠে। উল্লিখিত জায়গাগুলোয় স্থলপথ ব্যবহার করেই ছড়িয়ে পড়ে প্রথম আগমনকারীরা। তবে বিসমার্ক ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছতে সাগর পাড়ি দিয়েই যেতে হয়। এখন থেকে ৩০-৪০ হাজার বছরে আগেই অস্ট্রেলিয়ার সব জায়গায় আদিবাসীরা ছড়িয়ে পড়ে।

প্লাইস্টোসিন যুগের পর এশিয়া মহাদেশ পূর্ব দিকে এগোতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও, জাভা ও বালি দ্বীপ পূর্ব দিকে সরে অস্ট্রেলিয়ার এক হাজার মাইলের মধ্যে আসে। সে সময় এশীয়দের অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিতে ৫০ মাইল পর্যন্ত চওড়া অন্তত আটটি চ্যানেল ছিল। ৪০ হাজার বছর আগে সম্ভবত বাঁশের ভেলা কিংবা সাদামাটা প্রযুক্তির সমুদ্রগামী যান তাদের সহায় হয়। দক্ষিণ চীনের উপকূলে খুবই সাধারণ প্রযুক্তিতে তৈরি কিন্তু সমুদ্র চলাচল উপযোগী নৌযান এখনো দেখা যায়।

এখন থেকে হাজার বছর আগে সমুদ্র পাড়ি দেয়া মোটেও সহজ ছিল না। একপর্যায়ে এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমানোর ঘটনা কমে যায়। ফলে অন্য মহাদেশের প্রভাব হারিয়ে যায় নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজের ওপর। গড়ে ওঠে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আদিবাসী সম্প্রদায়। নতুন রূপ পায় তাদের ভাষাও। বাসিন্দাদের মধ্যে দৈহিক গঠন ও জিনগত পরিবর্তন ঘটে। এসব বিশ্লেষণে আদিবাসী অস্ট্রেলীয় ও নিউগিনির হাইল্যান্ডারদের সঙ্গে খানিকটা মিল পাওয়া যায় এশীয়দের।

তবে তা খুব বেশি নয়। কঙ্কাল ও দৈহিক গঠনে আদিবাসী অস্ট্রেলীয় ও নিউগিনির বাসিন্দারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের চেয়ে আলাদা।

আবার আদিবাসী অস্ট্রেলীয় ও নিউগিনির বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে দৈহিক গঠন ও ভাষার পার্থক্য। জেনেটিক পার্থক্যের মধ্যে একটি হলো রক্তের গ্রুপ। রক্তের গ্রুপ নির্ধারণে 'এ-বি-ও' পদ্ধতির 'বি' ও 'এম-এন-এস' পদ্ধতিতে 'এস'-এর আধিক্য রয়েছে নিউগিনির বাসিন্দাদের মধ্যে। কিন্তু আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে এ দুটির আধিক্য নেই। নিউগিনীয়দের চুল কোঁকড়ানো আর অস্ট্রেলীয়দের সোজা কিংবা ঢেউ খেলানো। দুই পক্ষের ভাষায়ও বিস্তর ফারাক।

প্রায় ১০ হাজার বছর আগে আরাফুরা সাগরের উদ্ভবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি। এর সুবাদে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে ওঠে দুটি সমাজ। দুই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক পার্থক্যও কম নয়। নিউগিনির অবস্থান নিরক্ষ রেখায়। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান নিরক্ষ রেখার ৪০ ডিগ্রি দক্ষিণে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে। নিউগিনির পাহাড়গুলো ব্যাপক রুক্ষ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ পাহাড়ের উচ্চতা সাড়ে ১৬ হাজার ফুট, যার চূড়ায় বরফ জমে। অথচ অস্ট্রেলিয়া নিচু ও প্রায় পুরো সমতল। সেখানকার ৯৪ শতাংশ এলাকার গড় উচ্চতা দুই হাজার ফুটের কম। নিউগিনি পৃথিবীর সবচেয়ে আর্দ্র ও অস্ট্রেলিয়া শুষ্কতম। নিউগিনির অধিকাংশ জায়গায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০ ইঞ্চি। উঁচু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ২০০ ইঞ্চিরও বেশি। অথচ অস্ট্রেলিয়ায় বছরে বৃষ্টি হয় ২০ ইঞ্চিরও কম। মৌসুম ও বছরের সঙ্গে সঙ্গে নিউগিনির জলবায়ু অল্প পরিবর্তন হয়। অন্য যেকোনো মহাদেশের তুলনায় প্রতি বছর ব্যাপক মাত্রায় পরিবর্তন হয় অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু। এ কারণে নিউগিনিতে অনেক বড় বড় নদ-নদী রয়েছে, যেগুলো সারা বছরই নাব্য। আর অস্ট্রেলিয়ায় এমন নদীর অবস্থান রয়েছে কেবল পূর্বাঞ্চলে। এমনকি দেশটির সবচেয়ে বড় নদী ব্যবস্থা মারে-ডার্লিংয়ে শুকনো মৌসুমে পানির অভাব দেখা দেয়। নিউগিনির অধিকাংশ অঞ্চল রেইন ফরেস্টে ঘেরা। আর অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ জায়গা মরুভূমি ও শুকনো বনভূমি।

নিউগিনিতে রয়েছে নবীন উর্বর মাটি, যা আগ্নেয়গিরি ও হিমবাহের পরিণামে সৃষ্ট। পাহাড়ি স্রোতে উর্বর পলিমাটি জমা পড়ে নিম্নভূমিতে।

বিপরীত দিকে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো অনুর্বর মাটি। সেখানে আগ্নেয়গিরি, বড় বড় পাহাড় ও হিমবাহের মতো প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য না থাকায় জীববৈচিত্র্যও কম। ফলে অস্ট্রেলিয়ার আকারের মাত্র এক-দশমাংশ হওয়ার পরও নিউগিনিতে যে বিচিত্র পশু-পাখি রয়েছে, তা প্রায় অস্ট্রেলিয়ার সমান। এমনই নানা কারণে দুটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস একই সমান্তরালে এগোয়নি।

ভৌগোলিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও আধুনিক কালে অস্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য বেশি। ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করে দেশটির সংস্কৃতি আমূল বদলে দেয়। দুই দেশের আদিবাসীদের পরিণতিও এক হয়নি। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া পরিচালিত হয় কয়েক কোটি সাদা চামড়ার মানুষের হাতে; যাদের অধিকাংশই ইউরোপীয়দের বংশধর। প্রতি বছরই অন্য মহাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছে নতুন মানুষ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা। ইউরোপীয়রা বসতি স্থাপনের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কমেছে ৮০ শতাংশ। এখনকার সামাজিক কাঠামোর নিচেই আদিবাসীদের অবস্থান। ঔপনিবেশিকদের কাছে নানা হাতিয়ারের সঙ্গে ছিল বন্দুক, বারুদ ও মহামারী। তাদের সঙ্গে আনা নতুন প্রজাতির শস্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খাপ খাইয়ে নেয়। ইউরেশিয়ার উষ্ণ অঞ্চলের শস্য পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়ার মূল শস্যে। এখন দেশটির প্রধান খাদ্যশস্য গম। এছাড়া রয়েছে বার্লি, যব, আপেল ও আঙ্গুর। আফ্রিকার সাহেল থেকে এখানে তুলা ও আন্দেজ থেকে আসে আলু। কিন্তু আদিবাসীরা ইউরোপীয় কায়দায় খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করেনি। পর্যায়ক্রমে ঔপনিবেশিক ও তাদের বংশধররাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নেয়।

ঔপনিবেশিকরা দুই উপায়ে আদিবাসীদের নিধন করে। প্রথমত. সরাসরি গুলি করে হত্যা। ১৮ ও ১৯ শতকে কোনো বাছবিচার ছাড়াই গুলি করে আদিবাসী হত্যার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। সর্বশেষ বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯২৮ সালে এলিস স্প্রিংসে। সেখানে একসঙ্গে ৩১ আদিবাসীকে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়ত. ইউরোপীয়দের সঙ্গে আসা জীবাণুতে কুপোকাত হয় আদি অস্ট্রেলীয়রা। ভিনদেশীদের দেহের কিছু রোগজীবাণুর সংস্পর্শে আসার পর তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি অনেক আদিবাসী। ১৭৮৮ সালে সিডনিতে পৌঁছে সাগর পাড়ি দেয়া ইউরোপীয়রা। এর পর পরই কয়েক বছর ধরে মহামারীতে মারা পড়ে সেখানকার আদিবাসীরা। এসব রোগবালাইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুটিবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, টাইফাস, জলবসন্ত, হুপিং কাশি, টিবি ও সিফিলিস।

# চীনাদের চৈনিক হয়ে ওঠার গল্প

বেশকিছু দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ভাষার উপস্থিতি। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতিসত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে এরা প্রত্যেকেই সহাবস্থান করে রাষ্ট্রের আওতায়।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার লোকদের রাষ্ট্রে সহাবস্থানের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রাশিয়ার কথা। ১৫৮২ সালের আগ পর্যন্ত মস্কোকেন্দ্রিক ছোট্ট একটি স্লাভিক রাজ্য হিসেবে টিকে ছিল দেশটি। ওই সময়ের পর থেকে রাজ্য বিস্তার করতে করতে উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত প্রায় এক ডজনেরও বেশি সংখ্যক স্লাভিক জনগোষ্ঠীর ভূখণ্ড দখল করে নেয় রাশিয়া। যদিও দেশটিতে অবস্থানরত প্রত্যেক জাতিসত্তাই এখনো ধরে রেখেছে নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি, ওইসব ভূখণ্ডের জনগণ এখন সবাই রুশ।

একইভাবে ইউরোপীয়দের নতুন মহাদেশ দখলের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার ইতিহাস। অন্যদিকে ভারতের নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ৮৫০, ইন্দোনেশিয়ায় এ সংখ্যা ৬৭০ ও ব্রাজিলের জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ২১০। একই রাষ্ট্রের আওতায় থাকা সত্ত্বেও এসব জনগোষ্ঠীর প্রতিটিই ধরে রেখেছে নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি।

চীনের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু ভিন্ন। খ্রিস্টপূর্ব ২২১ সালে একীভূত দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১২০ কোটির উপরে; যার মধ্যে ৮০ কোটিই কথা বলে মান্দারিন ভাষায়। বাকি জনগণের মধ্যে প্রচলিত প্রধান ভাষার সংখ্যা সাত। এসব ভাষার একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য তুলনা করা যায় ইতালীয় ও স্প্যানিশের মধ্যে পার্থক্যের সঙ্গে।

চীনের জনগণ মঙ্গোলয়েড বা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অন্যদের চোখে মঙ্গোলীয়দের দেখতে যতই এক রকম মনে হোক না কেন, এদের মধ্যে দৈহিক গঠন ও ভাষাগত পার্থক্য অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি। এ পার্থক্য সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের জনগণের মধ্যে। এরা দেহগত ও জিনগতভাবেই একে অন্যের চেয়ে আলাদা। উত্তর চীনের লোকদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায় তিব্বতি ও নেপালি জনগণের মধ্যে। অন্যদিকে দক্ষিণ চীনের জনগণের সঙ্গে মিল সবচেয়ে বেশি ভিয়েতনামি ও ফিলিপিনোদের সঙ্গে।

উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে আবহাওয়াগত পার্থক্যও রয়েছে। উত্তরের আবহাওয়ায় তুলনামূলকভাবে শুষ্কতা বেশি ও তাপমাত্রা কম। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে, এত পার্থক্য সত্ত্বেও এদের অধিকাংশের ভাষা ও সংস্কৃতি এক হয়ে উঠল কী করে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রথমে তাকানো যায় চীনের মানচিত্রে। এখানে মান্দারিন ও সাতটি 'বড়' ভাষার বাইরেও এ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ১৩০। এর মধ্যে কয়েকটি ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা হয়তো টেনেটুনে কয়েক হাজার হবে। চীনে প্রচলিত ছোট-বড় এসব ভাষা চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ ভাষাগুলোর স্থানবিন্যাসে একই ভাষাগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত জনগণের অবস্থান কিন্তু বেশ দূরে দূরে। এদের অবস্থান যেন অনেকটা চীনাভাষী জনসমুদ্রের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট ভিন্নভাষীর দ্বীপের মতো।

এসব ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম হলো, মিয়াও ইয়াও বা মং মিয়েন ভাষা পরিবার। এর আওতাভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান পাঁচটির নামকরণ হয়েছে বর্ণিল নামে— রেড মিয়াও, গ্রিন মিয়াও, হোয়াইট মিয়াও, ব্ল্যাক মিয়াও ও ইয়াও। চীনে মিয়াও ও ইয়াও ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ বাস করে ১২টির মতো ভিন্ন ভিন্ন বসতিতে। এর বাইরে আলাদা একটি ভাষাগোষ্ঠী আছে অস্ট্রোএশিয়াটিক পরিবারভুক্ত। ভিয়েতনামি ও কম্বোডীয় ভাষাও এর আওতায় পড়ে। চীনে এ দুটি ভাষায় কথা বলা লোক আছে প্রচুর।

প্রশ্ন উঠতে পারে, একই ভাষাগোত্রের লোকদের বাস তাহলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কেন? এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কি কোনো দৈবদুর্বিপাকের ফসল নাকি এর মধ্যেও লুকিয়ে আছে সবার চোখ এড়িয়ে যাওয়া কোনো ঐতিহাসিক সত্য?

এর একটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, এ ভাষাগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত জনগণ একসময় বাস করত পাশাপাশি একই সঙ্গে। কোনো এক কারণে মাঝের এক বিপুল জনগোষ্ঠী হঠাত্ তাদের পুরনো ভাষা ত্যাগ করে কথা বলা শুরু করেছে নতুন ভাষায়। কিন্তু সমস্যা হলো, পুরাতত্ব বা ভাষাতত্বে হঠাত্ কিংবা দৈববলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে এ বিচ্ছিন্নতার কারণ কী?

ইতিহাস বলে, এ ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতার ঘটনা ঘটেছে আড়াই হাজার বছর ধরে। থাই, লাও ও বর্মি ভাষাভাষীরা এ সময়ের মধ্যে দক্ষিণ চীন থেকে অভিবাসিত হয়েছে আরো দক্ষিণে। এ সময়ের মধ্যে চীনাভাষীরা অত্যন্ত আগ্রাসীভাবে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণে বাধ্য করেছে অন্যদের। চীনাভাষীরা চিরকালই অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে এসেছে তুচ্ছজ্ঞানে। খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ থেকে ২২১ শতাব্দীর মধ্যে চীনে ঝাও রাজবংশের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এ সময়ের ইতিহাস চীনাভাষীদের রাজ্য বিস্তার এবং অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপনের ইতিহাস।

ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তর চীনের অধিবাসীদের ভাষা ছিল আজকের চীনা ভাষা তথা মান্দারিন ও সিনো-তিব্বতীয় গোত্রের অন্যান্য ভাষা। দক্ষিণ চীনের অধিবাসীরা কথা বলত মিয়াও-ইয়াও, অস্ট্রোএশিয়াটিক ও তাই-কাদাই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলোয়। পরবর্তীতে যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে সিনো-তিব্বতীয় গোত্রের ভাষাভাষীরা উচ্ছেদ করেছে দক্ষিণ চীনের অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে। এমনকি থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশীয় উপদ্বীপের জনগণ খুব একটা বেশি দিন হয়নি তাদের প্রচলিত ভাষাগুলোয় কথা বলা শুরু করেছে। দক্ষিণ চীন ও ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ও সংস্কৃতি এসে হানা দিয়েছে তাদের রাজ্যে, মিশে গেছে অথবা প্রতিস্থাপন করেছে এখানকার ভূমিপুত্রদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। পুরনোদের সংঘাত ও মিশেলের ফল হিসেবে জন্ম নিয়েছে নতুন ভাষা।

চীন ও তার আশপাশ এলাকার এ ভাষা ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষার প্রচলন ও প্রসারের সঙ্গে। আগে নিউ ওয়ার্ল্ড তথা আমেরিকার আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষার সংখ্যা ছিল হাজারেরও বেশি। বিষয়টি এমন নয় যে, আদিবাসীরা নিজেদের আদি ভাষা বাদ দিয়ে ইউরোপীয় ভাষা কোনো প্রকার ভালো লাগা থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে। বরং ইউরোপীয় ভাষাভাষীরাই এখানকার আদিভাষাভাষীদের খুন করেছে নির্বিচারে। যুদ্ধ, হত্যা ও মহামারীর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কোনো আদিবাসীরা বাধ্য হয়েছে দখলদারদের ভাষা গ্রহণে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ লোক কথা বলে ইংরেজিতে। দখলদাররা নিজেদের প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক সংগঠনের সুবিধা নিয়েছে ভালোভাবেই। আদিবাসীদের তুলনায় দখলদারদের এ সুবিধাগুলোয় এগিয়ে থাকার কারণ ছিল, বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই খাদ্য উত্পাদন ব্যবস্থায় এগিয়ে যাওয়া।

একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে ইংরেজির আগ্রাসনে। আফ্রিকায় পিগমি ও খোসিয়ান ভাষারও একই দশা হয়েছে বান্টুদের আগ্রাসনে।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতোই এশিয়ায়ও শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের অবশিষ্টাংশ বলতে কিছু পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে। ওই সময়ের কোনো তৈজসপত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি কোথাও। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০ অব্দে ফলানো উদ্বৃত্ত ফসলের নমুনা, গৃহপালিত পশুর হাড়, বাসনকোসন ও মসৃণ পাথরের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ফার্টাইল ক্রিসেন্টে কৃষির বিকাশ ঘটে এরও হাজার খানেক বছর আগে। তবে ওই সময়ের চীন সম্পর্কে কোনো নৃতাত্ত্বিক ধারণা না থাকায় এ অঞ্চল ও ফার্টাইল ক্রিসেন্টে কৃষির বিকাশের সমসাময়িকতা নিয়ে কথা বলা মুশকিল। তবে এটুকু আন্দাজ করা যায়, এ দুই এলাকায় কৃষি ও পশুপালনের বিকাশ ঘটে সামান্য আগে-পরে। সে হিসাবে চীনকে বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষি ও পশুপালন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম বললেও ভুল হবে না।

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের দিকে এখানে ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়। চীন নিজেকে বিশ্বের প্রাচীনতম ঢালাই লোহা ব্যবহারকারী দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের দিকে। এর পরের দেড় হাজার বছর দেশটিতে দেখা গেছে নানা প্রযুক্তির উদ্ভাবন। এখানে নগর সুরক্ষায় প্রাচীরের ব্যবহার শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের দিকে। একই সঙ্গে আড়ম্বরহীনভাবে হেলায় প্রস্তুত মানুষের কবর ও সুসজ্জিত সমাধিসৌধ দেখে বোঝা যায়, ওই সময়ের মধ্যেই চীনা সমাজে শ্রেণীবিভক্তি ছিল। ওই সময়ের মধ্যেই খনন করা হয় বিশ্বের দীর্ঘতম খাল গ্র্যান্ড ক্যানেল (উত্তর ও দক্ষিণ চীনের সংযোগকারী খাল, লম্বায় এক হাজার মাইল)। দেশটিতে শিলালিপি সংরক্ষণের প্রবণতা দেখা দেয় খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সাল থেকে। যদিও অনেক আগেই আবিষ্কার হয়েছে লেখ্য রীতি। চীনের উদীয়মান নগর সভ্যতা ও প্রাচীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের নৃতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর সমর্থনে পাওয়া যায় ওই সময়কার প্রচুর লিখিত দলিল। এ দলিলগুলোয় খুঁজে পাওয়া যায় চীনে দুই হাজার বছর আগেকার জিয়া রাজবংশের ইতিহাস।

# আফ্রিকার সন্তানরা

আফ্রিকা মহাদেশের ছোট এক দেশ নামিবিয়া। ১৯৯০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বাধীন হওয়া দেশটি আগে ছিল জার্মানির উপনিবেশ। দেশটিতে বাস করে বেশ কয়েকটি জাতিসত্তার মানুষ। এদের মধ্যে রয়েছে— কৃষ্ণাঙ্গ হেরেরো, ওভামবো, শ্বেতাঙ্গ এবং বর্ণসংকর নামা উপজাতি। এছাড়া রাজধানী উইন্ডহোয়েকের বাইরে দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত কালাহারি বুশম্যান উপজাতির মানুষকে।

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের দ্বারা সংঘটিত সবচেয়ে বড় গণহত্যাগুলোর অন্যতম ছিল ১৯০৪ সালে হেরেরোদের ওপর হাইনরিখ গোয়েরিংয়ের নেতৃত্বে জার্মানদের নিধনযজ্ঞ। এ হাইনরিখ গোয়েরিং আবার হিটলারের প্রধান সহযোগী হারম্যান গোয়েরিংয়ের বাবা।

প্রতিবেশী দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বৈশ্বিক সংবাদপত্রগুলোর শিরোনামে না এলেও নামিবিয়ায় এখনো নানামুখী সংকট বিদ্যমান। নিজ ভূখণ্ডে আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশটিকে। আবার পুরনো ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রভাব থেকে এখনো বের হয়ে আসতে পারেনি। দেশটির অতীত আর বর্তমান জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। এদের বর্তমানকে বুঝতে অতীতের কাটাছেঁড়া বেশি জরুরি।

মানবজাতির জন্মভূমি আফ্রিকা। এখানেই বিকাশ ঘটে হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতি ও তার বংশধরদের। মানবজাতি এখান থেকেই ছড়িয়েছে সারা পৃথিবীতে। অধিকাংশ মানুষ আফ্রিকার অধিবাসী বলতে বোঝেন কিছু কৃষ্ণাঙ্গ লোকের কথা। আবার কৃষ্ণাঙ্গ বললে আমাদের চোখের সামনে ভাসে অ্যাফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের কথা। কৃষ্ণাঙ্গদের সবাইকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ধরে নিই আমরা। একইভাবে শ্বেতাঙ্গরাও আমাদের সাদা চোখে ধরা দেয় সম্পূর্ণভাবে আলাদা এক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে।

প্রকৃতপক্ষে গায়ের রঙ জাতিগোষ্ঠীগুলোর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বেশি কিছু নয়। আবাসস্থল কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণের মানুষের হোক; জাতিগত বৈচিত্র্য সবখানেই আছে। মানুষের জন্ম ও প্রাথমিক বিকাশস্থল আফ্রিকায়ও ছিল এবং আছে।

এখনকার মতো বহু বছর আগে, ইউরোপীয় দখলদাররা তখনো হানা দেয়নি আফ্রিকায়; মানবজাতির বড় ছয়টি ভাগের মধ্যে পাঁচটিরই প্রতিনিধিরা তত দিনে মহাদেশটিতে বসত গড়ে তুলেছে। এদের মধ্যে আবার তিনটিরই উৎপত্তি ঘটেছে এখানে। পৃথিবীর মোট ভাষার এক-চতুর্থাংশই উচ্চারিত হয় আফ্রিকায়। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার মতো মানববৈচিত্র্য আর কোনো মহাদেশে নেই।

এ বৈচিত্র্যের কারণ আফ্রিকার বিচিত্র জলবায়ু এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখানে মানুষের বসবাস। মহাদেশটিতে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম চিরহরিৎ বনাঞ্চল, শুষ্কতম মরুভূমি এবং বিষুবরেখা অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বত। অন্য যেকোনো মহাদেশের তুলনায় মানুষের ইতিহাস এখানে সবচেয়ে প্রাচীন। আজ থেকে প্রায় ৭০ লাখ বছর আগেও আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষরা এখানে চরে বেড়িয়েছে। বিবর্তনের ধারায় আদিতম হোমো স্যাপিয়েন্সেরা এখানেই জন্মেছিল।

গত পাঁচ হাজার বছরে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় রাজ্য বিস্তারের ঘটনা এখানে ঘটেছে দুটি; বান্টুদের এলাকা সম্প্রসারণ এবং মাদাগাস্কারে ইন্দোনেশীয়দের উপনিবেশ স্থাপন। এক হাজার খ্রিস্টাব্দের দিকেই পাঁচ ধরনের জনগোষ্ঠীর বাসভূমি হয়ে উঠেছিল আফ্রিকা। অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের কাছে যারা কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, আফ্রিকান পিগমি, খোইসান ও এশীয় নামে পরিচিত। শুধু চামড়ার রঙে নয়, এ পাঁচ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে চুলের গঠন ও রঙে এবং মুখের আদলে। এদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গরা পরবর্তীতে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ছড়ালেও তাদের আদিভূমি আফ্রিকাতেই। পিগমি ও খোইসানরা আফ্রিকার বাইরে পা রাখেনি কখনো। শ্বেতাঙ্গ ও এশীয়রা মূলত আফ্রিকার বাইরের মানুষ। মজার ব্যাপার হলো, অস্ট্রেলীয় আদিবাসী এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা ছাড়া গোটা মানবজাতি এ পাঁচ জনগোষ্ঠীর আওতায় পড়ে যায়।

কৃষ্ণাঙ্গদের বেলায় শুধু 'কৃষ্ণাঙ্গ' শব্দের প্রয়োগে তাদের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। জুলু, সোমালি ও আইবোসসহ এদের মধ্যে রয়েছে অনেক জাতিগোষ্ঠী। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের জায়গা থেকে তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। গায়ের রঙ যা-ই হোক; আফ্রিকান বলেই মিসরীয় এবং বর্বর জনগোষ্ঠীকে যেমন এক কাতারে ফেলা যায় না, তেমনি আবার শ্বেতাঙ্গ বলেই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গেও মেলানো যায় না।

অবশ্য অন্যদিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্যটাও অনেকটা আরোপিত বললেও ভুল হয় না। কারণ মানবজাতির সদস্যরা যেখানেই পা দিয়েছে, এক জাতির মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের মিলন ঘটেছে ভালোভাবেই, দুয়ের সংমিশ্রণে জন্ম নিয়েছে বর্ণসংকর নতুনরা। পূর্বজদের সঙ্গে তারা মিল এবং অমিল দুই-ই বজায় রাখতে পেরেছিল। তার পরও এ জাতিগোষ্ঠীগুলোর বৈশিষ্ট্যগত আলাদা বর্ণনার সুবিধা হলো, এতে তাদের ইতিহাস ভালোমতোই বোঝা যাবে।

সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ বলতে আমরা যাদের বুঝি, আজকের মতো ১৪০০ সালের দিকেও তারা অধিকার করেছিল আফ্রিকার বেশির ভাগ ভূমি। দক্ষিণ সাহারা এবং সাব-সাহারা অঞ্চলের পুরোটাই ছিল তাদের আওতাধীন। অ্যাফ্রো-আমেরিকান বলতে আমরা এখন যাদের চিনি, তাদের পূর্বপুরুষদের ধরে আনা হয়েছিল মূলত আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী এলাকা থেকে।

মরক্কো, লিবিয়া বা মিসরীয় অঞ্চলের যাদের চামড়ার রঙ তুলনামূলক শ্বেতকায়, আফ্রিকার ভূমিপুত্র শ্বেতাঙ্গ বলতে আমরা তাদেরই বুঝে থাকি। জিব্রাল্টার প্রণালি দিয়ে মহাদেশটির এ অঞ্চল ইউরোপের সবচেয়ে কাছাকাছি হওয়ায় সেই প্রাগৈতিহাসিক

যুগ থেকে এখানে ইউরোপীয়দের গমনাগমন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ঘোর শ্যামবর্ণের মানুষের বসতভিটা আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের এ উপস্থিতি তাই মোটেও অবাক করার মতো কিছু নয়।

আধুনিক ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এদের সবদিক থেকেই অমিল থাকলেও গায়ের রঙ ও চুলের সরল বৈশিষ্ট্যের কারণে এদের শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান বলা যায়। তবে আধুনিক কালের ঔপনিবেশিক বা ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের নীল চোখো স্বর্ণকেশীদের সঙ্গে এদের মেলানো যাবে না কোনোভাবেই।

আফ্রিকার ভূমিপুত্র কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রায় অধিকাংশই কৃষিজীবী। অন্যদিকে পরবর্তী দুটো দল পিগমি ও খোইসানরা তুলনামূলক যাযাবর জনগোষ্ঠী। এদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হলো শিকার-সংগ্রহবৃত্তি। চাষবাস বা গবাদিপশু পালনের প্রচলন এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। তাদের মধ্যে পিগমিরা বাস করে মধ্য আফ্রিকার বনাঞ্চলে। এদের গায়ের রঙ ও কোঁকড়া চুল দেখতে কৃষ্ণাঙ্গদের মতোই। কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে তাদের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো দেহের উচ্চতায়। পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে খর্বকায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পিগমিরা অন্যতম। প্রতিবেশী কৃষ্ণাঙ্গ চাষীদের সঙ্গে বিনিময় প্রথা বা তাদের ভাড়া খেটে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের ব্যবস্থা করে তারা।

আধুনিক পৃথিবীবাসীর কাছে আফ্রিকানদের মধ্যে সবচেয়ে কম পরিচিত জনগোষ্ঠী হলো খোইসানরা। এদের মধ্যে পশুপালক গোষ্ঠীটি পরিচিত ‘খোই’ (বুশম্যান) নামে। শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠীটিকে বলা হয় ‘সান’ (হটেনটট)। সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের তুলনায় এদের গায়ের রঙে হলদেটে ভাব একটু বেশি থাকলেও চুল দেখতে অনেকটা একই রকম। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণসংকর কিছু মানুষ রয়েছে, যাদের ‘কালারেডস’ বা ‘বাস্টারস’ বলা হয়। খোইসানদের সঙ্গে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মিলনের ফলে জন্ম নিয়েছে এরা।

আফ্রিকায় যেসব মানুষের উপস্থিতিতে অবাক হতেই হয় তারা হলো, মাদাগাস্কারের অধিবাসী। মহাদেশটির মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র ২৫০ মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে দ্বীপটির অবস্থান। গোটা ভারত মহাসাগরটাই এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দ্বীপটির দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। দ্বীপটির বাসিন্দারা মূলত দুটো জনগোষ্ঠীর বংশধর। শুধু আফ্রিকান ভূমিপুত্র নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আসা অভিবাসীদেরও রক্ত বইছে এদের শরীরে। শুধু তা-ই নয়, এ দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষাও অস্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এখানকার লোকদের কথ্য ভাষার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের মানুষের ভাষার সঙ্গে। কবে কখন কীভাবে সমুদ্রপথে চার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ইন্দোনেশীয় অভিবাসীরা মাদাগাস্কারে এসে বসতি গাড়ল সেটাই ভাবনার বিষয়। মাদাগাস্কারে ইউরোপীয়রা প্রথম চরণ ফেলেছিল ১ হাজার ৫০০ সালে। সে সময়কার বিবরণ থেকে জানা যায়, দ্বীপটিতে অস্ট্রোনেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি তত দিনে বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

আফ্রিকায় উচ্চারিত ভাষার সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি। এদের প্রত্যেকটিকে আবার পাঁচটি ভাষা পরিবারে ভাগ করা যায়। এ পাঁচটির মধ্যে আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষাগুলোয় কৃষ্ণাঙ্গ ও আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ উভয়েই কথা বলে। নাইলো-সাহারান এবং নাইজার-কঙ্গো পরিবারভুক্ত ভাষাভাষীরা সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। খোইসান ভাষা পরিবারের ভাষাগুলোয় কথা বলে খোইসানরা। আর অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষা পরিবারের ব্যবহারকারীরা হলো ইন্দোনেশীয়দের বংশধররা।

এ কথা সত্যি, ইউরোপীয় এবং এশীয়দের সঙ্গে আফ্রিকানদের পার্থক্য তাদের জাতিবৈচিত্র্যে নয়। জীবনযাত্রায় উন্নত সমাজ ব্যবস্থার অধিকারীরা ভৌগোলিক এবং জৈব-ভৌগোলিক সুবিধা পেয়েছে মাত্র। ঐতিহাসিকভাবেই এদের মধ্যে পার্থক্য তৈরিতে ভৌগোলিক অবস্থান প্রধান অনুঘটক না হলেও ভূমিকা অবশ্যই রেখেছে। ইস্পাত, বারুদ, মহামারী আর ভাষারীতির মতো অনবদ্য না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের ভূমিকা এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যাবে না কোনোভাবেই।

# মানবের ইতিহাস দর্শন

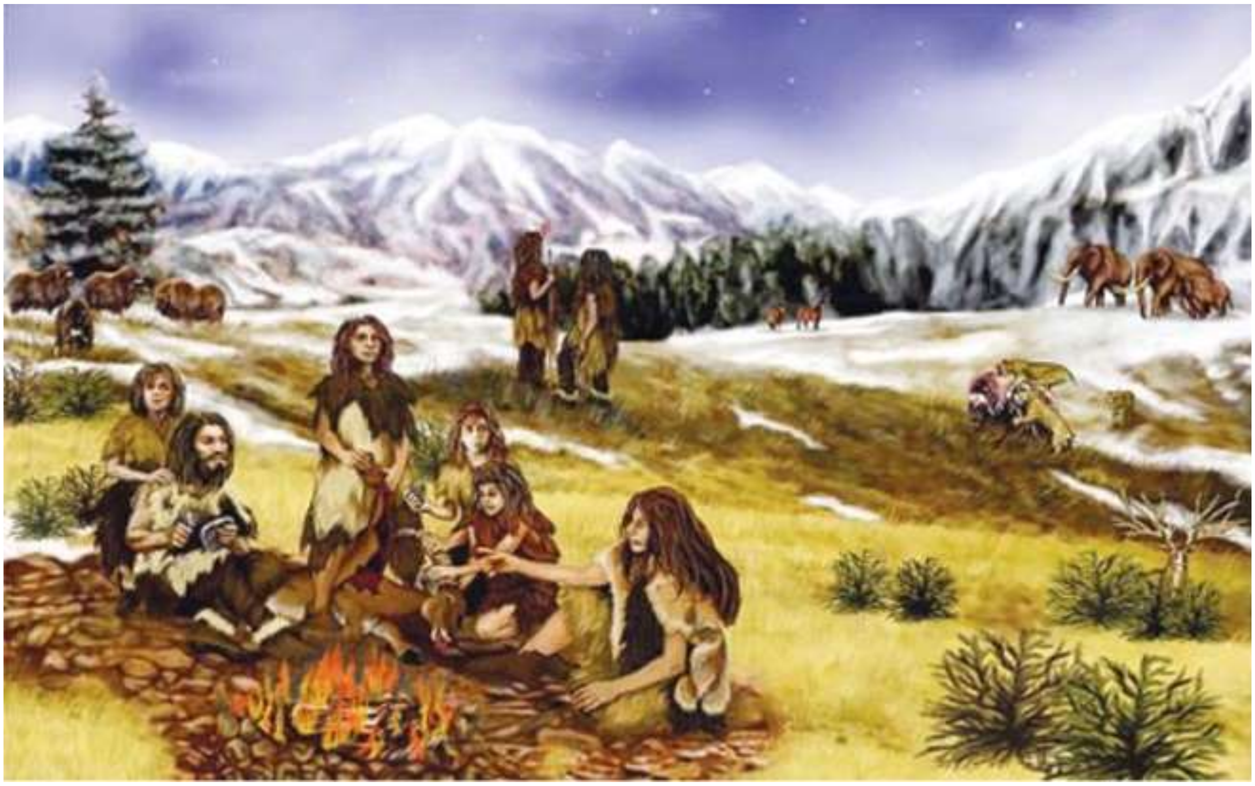

ইয়ালির প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মানবজাতির বর্তমান থেকে শুরু করে প্লাইস্টোসিন যুগ-পরবর্তী ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। ইতিহাসের পথ ঘুরে এসে ইয়ালির প্রশ্নের উত্তর একটাই দাঁড়ায়, কোনো জাতির পিছিয়ে পড়া বা এগিয়ে থাকার সঙ্গে তাদের মধ্যকার পার্থক্যের কোনো সম্পর্কই নেই। প্লাইস্টোসিন-উত্তর যুগে অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের সঙ্গে যদি ইউরেশীয়দের বাসস্থান বদল হয়ে যেত, তাহলে বর্তমান ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চল সেই আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দেরই দখলে থাকত এবং বর্তমান ইউরেশীয়রা হয়ে উঠত এক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী।

তবে এ বক্তব্যকে স্রেফ ধারণা বলেই উড়িয়ে দিতে পারেন অনেকে। কারণ এ দাবি যাচাইয়ের সুযোগ কম। কিন্তু ঐতিহাসিকদের বক্তব্য যাচাইয়ের কিছু পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রেও ইতিহাসকেই প্রামাণ্য ধরা হয়। বেশি দিন আগের কথা নয়, ইউরোপীয় কৃষকদের গ্রিনল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট প্লেইনে অভিবাসন এবং চীনা কৃষকদের চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জ, বোর্নিওর চিরহরিৎ বনাঞ্চল, জাভা বা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অভিবাসনের ইতিহাসের দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রতিটি জায়গাতেই দেখা গেছে, নতুন অভিবাসীদের আগমনের পর আগন্তুক অথবা আদিবাসী ভূমিপুত্ররা হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নয় নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফিরে গেছে শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনে অথবা গড়ে তুলেছে জটিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

একই রকমভাবে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ফ্লিন্ডার্স দ্বীপ, তাসমানিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসিত হয়ে কেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ আধুনিক পৃথিবীর সরলতম প্রযুক্তির জ্ঞান সঙ্গে করে পরিণত হয়েছে শিকারি-সংগ্রাহকে অথবা

কেউ নিজেদের গড়ে তুলেছে খাল খননকারী কৃষি ও মৎস্যজীবী হিসেবে। ঘটনাগুলোর প্রতিটিতেই অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে আবহাওয়া ও জলবায়ু।

পরিবেশের যেসব উপাদান মানবসমাজের গঠন ও বিকাশে ভূমিকা রেখেছে, সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত. বনজ ও প্রাণিজ সম্পদের বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় ভূমিকা রেখেছে সরাসরি। গৃহপালনের উপযোগী পশু বা চাষের উপযোগী ফসলের প্রজাতির সহজলভ্যতা শিকারি-সংগ্রাহক জাতিগুলোকে কৃষিজীবী করে তুলেছে। এতে সম্ভব হয়েছে খাদ্য উদ্বৃত্তের মজুদ তৈরি; যা ভূমিকা রেখেছে খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার বাইরে অন্যান্য বৃত্তির গঠন ও বিকাশে। শ্রম বিভাজন সম্ভব হওয়ায় সমাজের পক্ষে সম্ভব হয়েছে আরো বৃহদায়তনে উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে মোড় নেয়া। ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে উঠেছে সমাজ।

একই সঙ্গে উদ্বৃত্ত খাদ্য ব্যবস্থার ফলে জনসংখ্যাও বেড়েছে অনেক। প্রযুক্তিগত বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের আগে এ বাড়তি জনসংখ্যার কারণে এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে পেয়েছে সংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা। মানবজাতির ইতিহাসে প্রভাব সৃষ্টিকারী আরেকটি উপাদান হলো জনগোষ্ঠীগুলোর একে অন্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ বা ব্যাপক হারে অভিবাসনের প্রবণতা। এ প্রবণতার মধ্যেও আবার মহাদেশ অনুযায়ী দেখা গেছে ভিন্নতা। ইউরেশিয়ায় এ প্রবণতা ছিল সবচেয়ে বেশি; যার প্রধান কারণ ছিল এর পূর্ব ও পশ্চিম অক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃতি এবং অপেক্ষাকৃত কম রুক্ষ পরিবেশ ও ভৌগোলিক গঠন। এখানে ফসল ও গবাদিপশুর প্রাচুর্যও ছিল বেশি। একই সঙ্গে এখানে জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে প্রযুক্তিও তার প্রাথমিক যুগে এগিয়েছে বহুদূর।

আফ্রিকা ও আমেরিকার জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংমিশ্রণের গতি ছিল কম। মহাদেশগুলোর উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষে বিস্তৃতি এবং তুলনামূলক রুক্ষতর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ব্যাপক অভিবাসনের গতিও ছিল অনেক ধীর। একই কথা খাটে নিউগিনি অঞ্চলের ক্ষেত্রে। এখানকার অসমতল ভূমি ও উঁচু পর্বতশ্রেণীর কারণে এখানকার জনগোষ্ঠীগুলো কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা ভাষাতাত্ত্বিক একতাবদ্ধের দিকে যেতে পারেনি।

তৃতীয় আরেকটি উপাদান হলো আন্তঃমহাদেশীয় সংযোগ। এ সংযোগের ফলে প্রযুক্তি ও পালনযোগ্য পশুর বৈচিত্র্য বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়। আন্তঃমহাদেশীয় সংযোগের ক্ষেত্রেও মহাদেশগুলোর অবস্থান অনুযায়ী রকমফের তৈরি হয়। গত ছয় হাজার বছরে ইউরেশিয়া থেকে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের যোগাযোগে গবাদিপশুর আদান-প্রদান ও সংকরায়ণ হয়েছে প্রচুর। আফ্রিকার বনাঞ্চলের তৃণভোজী পশুর ঠাঁই হয়েছে ইউরোপীয় কৃষকের গোয়ালঘরে। একই রকমভাবে এক স্থানের প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত তলোয়ার দিয়ে লড়াই করেছে অন্য স্থানের যোদ্ধা।

কিন্তু আমেরিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ঘটনার নজির নেই। ইউরেশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে বিস্তীর্ণ মহাসাগরীয় জলরাশি দিয়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটির প্রাচীন সমাজের প্রযুক্তিগত বা গবাদিপশু আদান-প্রদান ছিল অসম্ভব।

দূরত্ব যত বেশি হয়েছে, এ আদান-প্রদানের গতি বা প্রবণতাও তত ধীর হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় ইউরেশিয়ার একমাত্র অবদান ছিল ডিঙি নৌকা।

চতুর্থ এবং সর্বশেষ উপাদান হলো মহাদেশগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যার ভিন্নতা। একটি জনগোষ্ঠীর আওতাধীন এলাকা বা জনসংখ্যা যত বেশি হবে, সে সমাজের প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। এছাড়া একই সঙ্গে বেড়ে যায় মহাদেশের অন্তর্গত সমাজগুলোর মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনের চাপ

বাড়ে সমাজগুলোর ওপর। এর কারণ হলো, কোনো জনগোষ্ঠীই অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায় না।

প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনে যে জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়ে, তার ভাগ্যে পরাজয় লেখা হয়ে যায়। আফ্রিকার পিগমি ও অন্যান্য শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠী এখানকার কৃষিজীবীদের হাতে এ কারণেই উচ্ছেদ হয়েছে বারবার। আবার এ কারণেই নিরন্তর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটিয়ে চলা এস্কিমো শিকারি-সংগ্রাহকদের হাতে উচ্ছেদ হয়েছে গ্রিনল্যান্ডের প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া ও উদ্ভাবনবিমুখ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী।

জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়ায় ভৌগোলিক ও পরিবেশগত এ চার উপাদানের ভূমিকা নিয়ে কোনোভাবেই প্রশ্ন তোলার জো নেই।

তবে একটা কথা ঠিক, মানবসমাজ যদি পুরোপুরি উদ্ভাবনবিমুখ হয়ে থাকত, তাহলে এখনো আমরা পাথরের হাতিয়ার দিয়ে কাটা মাংস কাঁচা অবস্থায়ই খেয়ে বেঁচে থাকতাম, ঠিক আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো।

প্রতিটি সমাজেই উদ্ভাবকের ক্ষমতা নিয়ে প্রচুর মানুষ জন্মায়। কিন্তু যে সমাজ তাদের এ ক্ষমতা কাজে লাগানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, তারাই এগিয়ে যায়। একই সঙ্গে পরিবেশ ও কাঁচামালের প্রাচুর্যের ভূমিকাকেও এখানে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

মানবসমাজের ইতিহাসে নানা উপাদানের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন, ঠিক একই রকম সমস্যার মুখোমুখি হন মহাকাশবিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ, জীববিজ্ঞানী, ভূতত্ত্ববিদ ও জীবাশ্মবিদরা। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনুযায়ী এর মাত্রায় দেখা যায় ভিন্নতা।

এসব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি নিয়েও সমালোচনা থাকতে পারে ব্যাপক। যেকোনো ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর মধ্যে ভিন্নতা এবং সেগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্রতা ও কার্যকারণ সম্পর্কের মাত্রা নির্ণয় করা বেশ কঠিনও বটে। অনুসন্ধানকারীর মনোযোগও এর মধ্যে বিশেষ কোনোটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার ঝুঁকি তো রয়েছেই। তবে বিজ্ঞানের যেকোনো শাখার তুলনায় ইতিহাসের উপাদানগুলো বোঝা আরো কঠিন। যদিও বিজ্ঞানের চোখে ইতিহাস অনেকটাই অগুরুত্বপূর্ণ। তবে ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এমন কিছু কার্যকর কর্মপদ্ধতি তৈরি হয়েছে, যার গুরুত্ব বিজ্ঞানের কাছে অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে জীবাশ্মবিদ্যা ও ভূপ্রাকৃতিক ইতিহাস এখন আর ইতিহাসের শাখা হিসেবে আটকে নেই। এ বিষয়গুলো এখন বিজ্ঞানের শাখা হিসেবেই বেশ ভালোভাবে স্বীকৃত।

বর্তমানকালে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা দাঁড়িয়ে আছে একে অন্যের সহায়ক হিসেবে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো ডাইনোসরবিদ্যা নিয়ে কাজ করা যেত, কিন্তু কোনোভাবেই তাদের বিলুপ্তির কারণ খুঁজে বের করা যেত না। কারণ উল্কাপাতের ঘটনা জ্ঞানের সম্পূর্ণ আলাদা একটি শাখা। ফলে কয়েক হাজার বছর আগে ডাইনোসরের জীবাশ্ম থাকলেও এবং সন্দেহাতীতভাবেই তা মানুষের চোখে পড়লেও এ নিয়ে অনুসন্ধানের কোনো সুযোগই ছিল না।

কিন্তু ডাইনোসরের ইতিহাসের তুলনায় মানুষের ইতিহাসে গভীরে গিয়ে ভাবনা অনুসন্ধানের সুযোগ অনেক বেশি। এ কারণেই আশা করা যায়, মানবসমাজের ইতিহাস পাঠ একদিন ডাইনোসরবিদ্যার মতোই পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াবে। অতীত নিয়ে অনুসন্ধান করলে আধুনিক সভ্যতার লাভবান ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ নেই কোনোভাবেই।

হয়তো আমাদের বর্তমান গড়ে দেয়া অতীতের অনুসন্ধানই হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে বোঝার মূল সূত্র।

# গানস জার্মস অ্যান্ড স্টিল

আফ্রিকা থেকে আমাজন— একই মানুষ,
বহুধা বসুধা। তের হাজার বছরে প্রতিটি
সমাজ বিকশিত হয়েছে যার যার ভিন্ন পথে।
সভ্যতার ইতিহাসকে অসংখ্য ভাষ্যকার বিবৃত
করেছেন নানাভাবে। নৃতত্ত্ব থেকে ব্যাধিবিদ্যা,
পরীক্ষাগার থেকে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ—
কতভাবে যে নির্ণীত হয়েছে
বিকাশের বিচিত্র ধারা! পুরো গল্পটিকে
গানস, জার্মস অ্যান্ড স্টিল নামে
এক মলাটে বেঁধেছেন পুলিৎজারজয়ী
জ্যারেড ডায়মন্ড। বিশ্বের ইতিহাসযাত্রা
অথবা ইতিহাসের বিশ্বভ্রমণ—